পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা

শ্যামাপ্রসাদ

কবিশেখর শ্রী কালিদাস রায়

তাঁর অমর বাণী

'অন্যায়ের প্রতিবাদ করো, প্রতিরোধ করো,
প্রয়োজনে নাও প্রতিশোধ।'

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
মোঃ ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা
শ্যামাপ্রসাদ

কবিশেখর শ্রী কালিদাস রায়

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
মোবাইল ঃ ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

লেখক পরিচিতি

কবিশেখর কালিদাস রায় বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ২২শে জুন ১৮৮৯ সালে (৭ই আষাঢ় ১২৯৬) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, বৈয়াকরণ, সমালোচক, ভাষাবিদ, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাব্রতী ও সমাজচিন্তক। তিনি আজীবন একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের মধ্যে অন্যতম জ্যোতিষ্ক।

তিনি রংপুর জেলার উলিপুরে মহারাণী স্বর্ণময়ী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ও পরে কলিকাতায় এসে বড়িষা হাইস্কুলে এবং পরবর্তী কালে ১৯৩১ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করেন।

আঠারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গকৃত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "কুন্দ" প্রকাশিত হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "পর্ণপুট", "ব্রজবেণু", "ঋতুমঙ্গল", "বৈকালী", "হৈমন্তী", "আহরণ", "রসকদম্ব", "দন্তরুচী কৌমুদী", "গাথামনি", "গাথাকাহিনী" শ্রেষ্ঠ কবিতা ইত্যাদি। "গীতগোবিন্দ", "কাব্যে শকুন্তলা", "কুমারসম্ভব", "গীতা লহরী", "ব্রজবাঁশরী", "ইন্দুমতী", "মেঘদূত" তাঁর কাব্যানুবাদের নিদর্শন।

সমালোচনা মূলক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "সাহিত্য প্রসঙ্গ" (১ম, ২য় ভাগ) "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য" (১ম, ২য়, ৩য় ভাগ), "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়", "শরৎ সাহিত্য" (১ম, ২য় ভাগ), "পদাবলী সাহিত্য", "দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা ও গান", "শাব্দিক", "রবীন্দ্র প্রসঙ্গে" এবং "শরৎ সান্নিধ্যে" উল্লেখযোগ্য। রম্যরচনা গুলি "চালচিত্র", "রঙ্গ চিত্র", "চণক সংহিতা", নির্বাচিত সরসগল্পে সঙ্কলিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে "কবিশেখর" উপাধিতে ভূষিত করেন, বিশ্বভারতী প্রদত্ত কলেন "দেশিকোত্তম"। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক "জগত্তারিণী" ও "সরোজিনী" স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত এবং "পূর্ণাহুতি" কাব্যগ্রন্থের জন্য "রবীন্দ্র পুরস্কার" পান। রবীন্দ্রভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা ডি, লিটে সম্মানিত। আনন্দবাজার পত্রিকাও তাঁকে "আনন্দ" পুরস্কার প্রদান করেন,

তিনি ১৯৭৫ সালে ২৫শে অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

প্রকাশকের নিবেদন

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি সংক্ষিপ্ত, সর্বজনবোধ্য, জীবনী প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে কবিশেখর শ্রী কালিদাস রায় লিখিত 'শ্যামাপ্রসাদ' পুস্তকটির কথা প্রথমেই স্মরণে আসা স্বাভাবিক। লেখক স্বয়ং রচনাটিকে 'পুস্তিকা' বলেছেন; সবিনয়ে স্বীকার করেছিলেন যে সেই কর্মঘন, ঘটনা-বহুল, স্বল্পায়ু এক মহান ব্যক্তিত্বের জীবন এত সংক্ষিপ্তাকারে ধরা যাবে না। তবু তিনিই প্রথম ১৯৫৩ সালে শ্যামাপ্রসাদের মর্মন্তুদ, আকস্মিক, রহস্যজনক অবস্থায় মৃত্যুর পর, যা' তথ্য তখন তাঁর হাতে ছিল তাই নিয়ে, এই সংক্ষিপ্ত জীবনী, বিশেষ ছাত্রসমাজের কথা চিন্তা ক'রে, সর্বজনগ্রাহ্য ক'রে রচনা করেন। কবিশেখরের রচনার ভাষা-মাধুর্য ও সাহিত্যগুণ সম্পর্কে কিছু বলা ধৃষ্টতা ও বাতুলতা। তিনি শুধু কবি ছিলেন না, ছিলেন মহান শিক্ষক, দেশপ্রেমী এক জনদরদী মানুষ। তাঁর সঙ্গে স্যার আশুতোষের পরিবারের সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের। তাঁর চার পুত্র, শ্রী ভবভূতি রায়, শ্রী জয়দেব রায়, শ্রী কবিকঙ্কন ও শ্রী কবিরঞ্জন রায় এই পুস্তকটির পুনর্মুদ্রণ প্রস্তাবে বিনাশর্ত্তে, সাগ্রহে সম্মতি জানিয়ে আমদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ১৯৫৩ সালে অনুদ্ঘাটিত ও বর্ত্তমানে প্রাপ্ত কিছু তথ্যের ভিত্তিতে সামগ্রিকতা ও পূর্ণতার জন্য পুস্তকটির পরিবর্দ্ধনের প্রয়োজন বোধে কিছু কিছু অংশ সংযোজিত হয়েছে মাত্র। লেখকের মূল রচনা যা'তে অপরিবর্ত্তিত থাকে সে ক্ষেত্রে, আশা করা যায়, দায়বদ্ধতার কোন অভাব হয়নি।

৬ জুলাই, ২০০০।
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ফাউণ্ডেশন,
আশুতোষ মুখার্জী মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউশন,
৭৭ আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা ৭০০০২৫।

সূচী পত্র

শ্যামাপ্রসাদ

শ্যামাজননীর মহাপ্রসাদ শ্যামাপ্রসাদ তুমি,
হয়েছ ধন্য তোমারে স্তন্য পিয়ায়ে বঙ্গভূমি।
তুমি আজ নাই, শুনিব না আর সিংহের গর্জ্জন।
সিংহবাহিনী অঝোরে অশ্রু করিছেন বর্ষণ।
বহিয়াছ তুমি অবলের ভার সবল অংশ 'পরে,
সহিয়াছ ক্লেশ বেদনা অশেষ দুর্গতদের তরে।
মরণাহতের শ্মশানবন্ধু শরণাগতের ত্রাতা,
তোমারে হারায়ে পথভিখারিণী আজি তব দেশমাতা।
শিবিরে করনি বিশ্রাম কভু, যত দিন ছিলে বাঁচি,
ঘরে ও বাহিরে দুহাতে সমান যুঝেছ সব্যসাচী।
হে বরোদাত্ত, হে ভীমকান্ত, চিরচাপল্যহীন,
শফরীর হ্রদে অগাধ-সলিল-সঞ্চারী মহামীন।
ন্যায়-দেবতার বেদীতেই শুধু প্রণত তোমার শির
অসত্য সাথে সন্ধি করিতে পার নাই মহাবীর।
সারাটি দেশের বেদনার ভার বহিতে পারে কি দেহ ?
ভূধরের সম দুর্বহভার সহিতে পারে কি কেহ?
বীরলোকে তুমি করিলে প্রয়াণ মোরা শোকে কাঁদি বৃথা,
দেশজননীরে কোন সান্ত্বনা দিয়ে, গেলে বল, মিতা।

শ্যামাপ্রসাদ

যাদের দেশবৈরী মনে করা হ'ত তাদের গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে হত্যা ক'রে বা হত্যার চেষ্টা ক'রে বর্তমান যুগে যে সকল বিপ্লবী-যুবক আত্মহুতি দিয়েছেন কিংবা রাজদণ্ড ভোগ করেছেন তাঁদের শহীদ বলা হয়। আর যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়ে কারাদণ্ড ও নানা প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করেছেন, তাঁদের আমরা বলি দেশমাতৃকার বীরসন্তান।

কিন্তু যে তেজস্বী বীরপুরুষ ন্যায়, সত্য, স্বাধীনতা ও দেশের দুঃস্থ-দুর্গতদের জন্য আজীবন ঘরে-বাইরে সংগ্রাম করে প্রতি মুহূর্তে নিজের জীবন ও সর্বস্ব বিপন্ন করে শেষ পর্যন্ত দেশের কল্যাণের জন্যই জীবন উৎসর্গ করলেন, তাঁর মত বীরসন্তান বঙ্গমাতার কয় জন জন্মেছেন? এই বীরসন্তান 'শ্যামা' বঙ্গভূমির 'প্রসাদ' শ্যামাপ্রসাদ। শ্যামাপ্রসাদই বাংলার শেষ বীরসন্তান। চারিদিকে চেয়ে আর তো বাংলাদেশে কাহাকেও দেখি না, যিনি শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বের স্থান পূরণ করতে পারেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুতে আমাদের মনে হয়েছে বাংলার মত দুর্ভাগ্য দেশ জগতে আর নেই।

এই স্বল্প পরিসরে সেই দেশবরেণ্য শ্যামাপ্রসাদের জীবন-চরিত সংক্ষেপে বিবৃত করবো।

পারিবারিক পরিচয়

শ্যামাপ্রসাদ স্বনামধন্য বিরাট পুরুষ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চার পুত্রের মধ্যে মধ্যম জন। জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বধর্মনিষ্ঠ রমাপ্রসাদ কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হন, তৃতীয় পুত্র শুচিশীল উমাপ্রসাদ ছিলেন ব্যবহারজীবি, আইনের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ভ্রমণ সাহিত্যিক এবং চতুর্থ পুত্র শান্তিপ্রিয় বামাপ্রসাদ ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। শ্যামাপ্রসাদের তিন ভগিনীর মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা কমলার দ্বিতীয়বার বৈধব্যের পর পিতা বর্ত্তমানেই মাত্র আটাশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। মধ্যমা ভগিনী স্বর্গতা অমলার বিবাহ হয়েছিল বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও ব্যবহারজীবি ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সর্ব কনিষ্ঠা রমলার বিবাহ হয় অধ্যাপক ডাক্তার অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শ্যামাপ্রসাদের বিবাহ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বৈবাহিক ও গুরুস্থানীয় কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তির পৌত্রী ও ডাক্তার বেণীমাধব চক্রবর্ত্তির জ্যেষ্ঠা কন্যা সুধাদেবীর সঙ্গে। ১৯৩৩ সালে অকালে সুধাদেবীর মৃত্যু হয়, ৩২ বৎসর বয়সে বিপত্নীক শ্যামাপ্রসাদ জীবনে আর দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করার কথা চিন্তা করেন নি। শ্যামাপ্রসাদের দুই পুত্র-জ্যেষ্ঠ স্বর্গত অনুতোষ ও কনিষ্ঠ দেবতোষ। অনুতোষ ব্যবসায় কার্যে ব্রতী ছিলেন; তাঁর বিবাহ হয়েছিল বিখ্যাত শিল্পপতি বোম্বাই প্রবাসী শিব ব্যানার্জীর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গতা মীরা দেবীর সঙ্গে। দেবতোষ অধুনা জামশেদপুরবাসী, টাটায় কর্মরত ছিলেন। দুই কন্যার মধ্যে প্রথমা সবিতার বিবাহ হয় স্বর্গত নিশীথরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, তিনি ছিলেন টাটানগরে পরে কলিকাতায় বড় ইঞ্জিনীয়ার। কনিষ্ঠা কন্যা আরতির বিবাহ হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ইঞ্জিনীয়ার পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে। —শ্যামাপ্রসাদের জননী রত্নগর্ভা যোগমায়া দেবী তাঁর মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন; তাঁর শোকমগ্ন, দুঃখময় জীবনের অবসান হয় পুত্রের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর। এরূপ শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে ৬ই জুলাই ১৯০১ সালে পুরুষসিংহ শ্যামাপ্রসাদের জন্ম।

শ্যামাপ্রসাদের ছাত্রজীবন

স্যার আশুতোষ তাঁর পুত্রদের ও অন্যান্যদের সুশিক্ষার জন্য ভবানীপুরে কলিকাতা মিত্র ইন্সটিটিউশানের একটি শাখা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তৎকালের আদর্শ শিক্ষাব্রতী, শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্রকে উৎসাহিত করেন। স্যার আশুতোষের তত্ত্বাবধানে উক্ত বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই বিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষারম্ভ হয়। প্রধান শিক্ষক স্বর্গত সতীশচন্দ্র বসুর তিনি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ স্কুলে ছিলেন অতি শান্ত সুশীল ছাত্র। ১৯১৭ সালে সরকারী

বৃত্তিসহ তিনি এই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। "বিদ্যালয়ে পড়াইবার সময় তাহার কয়েকটি গুণের কথা বেশ মনে পড়িতেছে। সমবয়সী বালকদের সঙ্গে সে কখনও কলহ করিত না। সকলের সঙ্গে বেশ সমানভাবে মিশিত। বড়লোকের ছেলে বলিয়া কখনও অহংকার করিতে তাহাকে দেখি নাই। বস্তুতঃ বিদ্যালয়ে তাহার ব্যবহারটি বড়ই মধুর ছিল। কাহারও প্রতি কোন বিদ্বেষ বা রোষের ভাব প্রকাশ পাইত না, পড়াশোনাও খুব মনোযোগের সহিত করিত। কোন কঠিন বিষয়ও বুঝাইলে সহজে বুঝিত। শিক্ষকগণের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা দেখাইতে কুণ্ঠিত হইত না। আমি নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, জর্জ ওয়াশিংটন, প্রভৃতি বীরগণ সম্বন্ধে গল্প করিলে দেখিতাম বেশ কান পাতিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত আয়ত্ত করিতেছে। উত্তরকালে শ্যামাপ্রসাদ—বিদ্যা, বিনয়, পাণ্ডিত্য, সমদর্শিতা প্রভৃতি যে সব গুণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ছেলে-বয়সেও তাহার মধ্যে সেই সব গুণের আভাস দেখিতাম।" স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, মিত্র স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীহর্ষনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল।

তারপর শ্যামাপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯২১ সালে এই কলেজ থেকে ইংরাজি সাহিত্যে অনার্সে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. পাশ করেন। স্বাভাবিকভাবে ইংরাজি সাহিত্যেই এম.এ. পড়িবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি বাংলা সাহিত্যে এম. এ. শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। স্যার আশুতোষ অল্পদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষায় এম. এ. পরীক্ষা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। যাতে বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষা দেওয়ার দিকে ছাত্ররা আকৃষ্ট হয়, সেজন্য তিনি আপন পুত্র শ্যামাপ্রসাদকে উক্ত ভাষায় এম.এ. পড়তে উৎসাহিত করেন। ১৯২৩ সালে শ্যামাপ্রসাদ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। এরপর তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে বি. এল. পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসার জন্য প্রস্তুত হন।

শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে স্কুল-কলেজের মামুলী শিক্ষাটাই সবচেয়ে বড় কথা ছিল না। স্যার আশুতোষের গৃহ ছিল সারা দেশের সারস্বত তীর্থ। দেশের যত গুণী, জ্ঞানী ও অধ্যাপকদের সমাগম ও মিলনের ক্ষেত্র ছিল এই পুণ্য তীর্থে। শ্যামাপ্রসাদ তাঁদের সাহচর্যে ও সংসর্গে অনেক কিছু শিক্ষালাভ করে অল্প বয়সেই জ্ঞান প্রাবীণ্য অধিগত করেন। শ্যামাপ্রসাদ অদ্বিতীয় শিক্ষাব্রতী পিতা স্যার আশুতোষের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার কার্যকলাপ ও ভাবধারার সঙ্গে ছাত্রজীবনেই পরিচিত হয়েছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির নব নব ভাবে সঞ্জীবিত পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই শ্যামাপ্রসাদের প্রধান শিক্ষা হয়েছিল। ছাত্র হিসাবে তিনি

ছিলেন অসাধারণ অধ্যাবসায়ী, পাঠনিষ্ঠ, জ্ঞান পিপাসু ও উচ্চাকাঙ্খী। ১৯২৭ সালে তিনি ব্যারিস্টার হ'য়ে বিলেত থেকে ফিরে আসেন। শ্যামাপ্রসাদের জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ধারার এক শুভ সম্মিলন ঘটেছিল।

শিক্ষাব্রতী শ্যামাপ্রসাদ

প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, পরে ব্যারিস্টার হলেও আইন ব্যবসায়ের প্রতি শ্যামাপ্রসাদের অনুরাগ জন্মায়নি। ব্যবহারজীবি হলে তিনি যে ভারত বিখ্যাত হতে পারতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি পিতার বৃত্তিকে নয়, ব্রতকেই বরণ করলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দেশে শিক্ষার সংস্কার ও বিস্তারের জন্য সারস্বত ক্ষেত্রেই প্রবেশ করলেন। যে বৎসর বি. এল. পাশ করেন সেই বৎসরই তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হলেন। তারপর থেকে বহু বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্যতা করেন। তিনি ১৯২৬ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লণ্ডনের মহাসম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সম্মেলনে, পরবর্ত্তিকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর সঙ্গে যোগদান করে ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার হন। চার বৎসর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এত অল্প বয়সে কেউ কখনও এই উচ্চ পদ লাভ করেননি। বহু বৎসর ধরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন, কলাবিভাগে ডীনও ছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, তার বিধিবিধান, কার্যপদ্ধতি তন্নতন্ন ক'রে অধিগত করেছিলেন তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রত্যেক বিষয় ছিল তাঁর নখদর্পণে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে কোন বিষয়ের বিতর্কে তিনি তাই অপরাজেয় ছিলেন। কেবল ভাইসচ্যান্সেলার নয়, নানাপদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি বহুবৎসর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি, লোকে যেমন জীবিকার জন্য অফিস আদালতের কাজ করে, সেইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দিনের সমস্ত কাজের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করতে গিয়ে তিনি শিক্ষাব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। শ্যামাপ্রসাদ আশুতোষের প্রারব্ধ ব্রতের উদ্‌যাপন করেন, পিতা প্রবর্ত্তিত কর্ম পুত্র সমাপ্ত করেন। তাঁরই প্রেরণায় স্কুলে বাংলা ভাষায় সকল বিষয়ের

পঠন-পাঠনের সূত্রপাত হয় এবং বাংলা পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তাঁর প্রেরণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শাখায় গবেষণায় তৎপরতা জন্মে। তাঁর উৎসাহ ও সাহচর্যে বহু নূতন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বিজ্ঞান বিভাগেও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন, তাঁরই আগ্রহে বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচিত হয়। শিক্ষকদের ট্রেনিং এর জন্য নূতন কলেজ স্থাপিত হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞান বিভাগের প্রবর্ত্তন করেন। বিহালী লাল মিত্রের দানের অর্থে তিনি নারী শিক্ষারও উন্নতি সাধন করেন। পুরাতত্ত্বের গবেষণার জন্য আশুতোষ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা তাঁরই অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে তিনি নবকলেবর দান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক-প্রকাশ বিভাগ (ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস) থেকে অনেক উৎকৃষ্ট বাংলা ও অন্যান্য গ্রন্থাদি তাঁরই আগ্রহে ও উৎসাহে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলা দেশের বহু সাহিত্যিক বিবিধ পরীক্ষায় পরীক্ষকপদে নিযুক্ত হন। বিভিন্ন বিদ্যার গবেষণায় তিনি উৎসাহ দিতেন, কৃতি ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য উৎসাহিত করতেন এবং নানাভাবে তাদের সহায়তা করতেন। উপাচার্য হিসাবে প্রথম বছর থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করার নিয়ম করেন ও ছাত্র সমাজকে এই উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানে সমবেত করতেন। ছাত্ররা যা'তে স্বল্পমূল্যে এবং প্রয়োজনে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি ছাত্রকল্যাণ বিভাগ খোলেন। ঢাকুরিয়া লেকে এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাব খোলা হয়। উপযুক্ত ছাত্রদের কর্মসংস্থানের সমস্যা নিয়ে এসময়ে তাঁর নানা চিন্তার প্রকাশ দেখা যায় বক্তৃতাবলীতে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে তখন বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল, শ্যামাপ্রসাদ প্রথমেই তা বাংলায় প্রবর্ত্তন করতে চেয়েছিলেন। বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শরীরচর্চাও ছাত্র পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তাঁরই উৎসাহে, তিনিই ইউনিভার্সিটি ক্যাডেট কোর নামক সংগঠনের প্রবর্ত্তন করে ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার সুযোগ করে দেন। কতভাবে যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণ সাধন করেছেন—তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার স্থান এই পুস্তিকায় নেই। শ্যামাপ্রসাদের কর্মঘন যৌবনকাল বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির কল্যাণসাধনেই অতিবাহিত হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. ডিগ্রি এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল. এল. ডি ডিগ্রি দান ক'রে সম্মানিত করে। ছাত্র বৎসল শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সংসদে নেতৃত্ব দান ক'রে ছাত্রদের যে কত কল্যাণ সাধন করেছিলেন এখনকার ছাত্ররা তা জানেও না।

শ্যামাপ্রসাদ আমৃত্যু তাঁর প্রিয় বিদ্যালয় মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন ভবানীপুর ও আশুতোষ কলেজের কর্মসমিতির সভাপতি ছিলেন।

বিবিধ ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদের কর্মতৎপরতা

শ্যামাপ্রসাদের অসাধারণ কর্মতৎপরতা শুধুমাত্র শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না—সংস্কৃতির বিবিধ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সামর্থ নিয়োগ করেছিলেন। তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্রের সর্বোচ্চ কর্ম-পরিষদের তিনি সদস্য ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল অফুরন্ত কর্মশক্তির বিরাট ভাণ্ডার, জীবনযাত্রায় আরাম-বিশ্রাম, ভোগবিলাস একেবারেই ছিল না। রাত্রিকালের অধিকাংশ সময় তাঁর চিন্তা অধ্যায়ন ও পরদিনের কৃত্য-কর্ত্তব্যের আয়োজনেই কেটে যে'ত। সারা দিন বহুজন পরিবেষ্টিত হয়ে, বহু কর্মের মধ্যে সময় অতিবাহিত হত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও সর্বভারতীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ড পরিব্যাপ্ত ছিল।

বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে তাঁর নিজের ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অসাধারণ দায়বদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্যামাপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ. পরীক্ষায় ইংরেজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া সত্ত্বেও পিতার নির্দেশে প্রথমবার সদ্য প্রবর্ত্তিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান সহকারে পাশ করেন। তিনি যখন কলেজের ছাত্র সেই সময় তাঁর অগ্রজ রমাপ্রসাদ "বঙ্গবানী" নামে একখানি প্রথম শ্রেণির মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করেন; পত্রিকাটি স্যার আশুতোষের আবাস গৃহ থেকেই প্রকাশিত হ'ত। 'বঙ্গবানী' প্রকাশের ফলে তাঁদের পরিবারে এক সাহিত্যিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি হয়। যদিও শ্যামাপ্রসাদ বাংলা এম. এ. ক্লাসে এক নম্বর ছাত্র ছিলেন, তবু তাঁর কর্মবহুল জীবনে স্বাধীনভাবে সাহিত্য-সেবার তেমন অবকাশ মেলেনি। কর্মবীরদের ধর্মচর্চা ও সাহিত্য সেবার সুযোগ হয় শেষ জীবনে। শ্যামাপ্রসাদ দীর্ঘ জীবন লাভ করলে নিশ্চয় একদিন সাহিত্য সরস্বতীর আহ্বান শুনতে পেতেন। সাহিত্যস্রষ্টা না হলেও তাঁর জীবনব্রত সাহিত্যসংসর্গ বর্জ্জিত ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসাবে তাঁর সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ ছিল, বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতেন এবং বহু সাহিত্য পুস্তকের তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল বলেই অনেক সাহিত্যগ্রন্থ লেখকেরা তাঁর নামে উৎসর্গ করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দেবার জন্য শ্যামাপ্রসাদ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। তাঁর বক্তৃতাগুলি

পড়লে উপলব্ধি হয় যে সেগুলি প্রধানত তথ্যমূলক ও যুক্তি নিষ্ঠ হলেও সাহিত্য সৌষ্ঠব থেকে বঞ্চিত নয়। স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য দারুণ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা তাঁর বক্তৃতাগুলিকে সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করেছে। বাংলায় তাঁর দু'খানি পুস্তক আছে—"পঞ্চাশের মন্বন্তর" ও "রাষ্ট্রসংগ্রামের এক অধ্যায়", তাঁর "দিন পঞ্জী"ও এখন প্রকাশিত হয়েছে। এই দু'খানিকে নিছক রাজনীতিক তথ্যগর্ভ রচনা বলে বিদায় দেওয়া যায় না। রচনা দুটিতে বর্ণে বর্ণে তাঁর উত্তপ্ত ও বিগলিত হৃদয়ের আবেগপ্লুত স্পর্শ আছে। এক গভীর মানবিক বেদনার ফল্গুধারা পুস্তক দু'খানির মধ্যে প্রবাহিত। এখানে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য ঃ বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির সভাপতিরূপে তিনি বাংলার বাইরে বঙ্গভাষা প্রচারে সর্ববিধ সহায়তা করেন। বহু সাহিত্য সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। কটক বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের তিনি ছিলেন সভাপতি, এটিই তাঁর সাহিত্য সভায় শেষ সভাপতিত্ব।

এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল-এর সভাপতি ছিলেন দু'বছরের জন্য। বৌদ্ধ আন্তর্জাতিক সংগঠন মহাবোধি সোসাইটিরও সভাপতি ছিলেন তিনি। সারিপুত্ত ও মোগালায়নের পূত অস্থি ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নিকট থেকে গ্রহণ ক'রে সাঁচীস্তুপে সেই পূত অস্থি তিনি নিজ হস্তে সংস্থাপন করেন। বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র ও বিজ্ঞানী বিদ্বদ্ সমাজের সঙ্গে শিক্ষাবিদ্ হিসাবে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল। কলিকাতায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্‌টিভেশান অফ্ সায়েন্স, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্সটিটিউট, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তিনি সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য ছিলেন। ব্যাঙ্গলোরে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ্ সায়েন্সের নীতিনির্দ্ধারক ও সংগঠন পরিচালক সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি বেণারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য হিসাবে বহু বছর যুক্ত ছিলেন। এ সব ছাড়াও অসংখ্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। সহায়তা করেছেন, সভাপতিত্ব করেছেন, বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন উদ্যোক্তা। যামিনী ভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার পরিচালন সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। আরও দুই/তিনটি হাসপাতার পরিচালনায় তাঁর আংশিক কর্তৃত্ব ছিল। তাঁর আর একটি দিক একেবারেই অনুদ্ঘাটিত রয়ে গিয়েছে ঃ সাংবাদিকতায় শ্যামাপ্রসাদ, ১৯৪৪ সালে তিনি ইংরাজি দৈনিক পত্রিকা 'ন্যাশানালিস্ট' প্রকাশ করেন। দৈনিক "হিন্দুস্থান" নামে পরে আর একটি সংবাদপত্রও প্রকাশ করেন। এই স্বল্প পরিসরে তাঁর সেই সুবিশাল কর্মকাণ্ডের অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

রাজনীতির মঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ ঃ আইন সভায় প্রবেশ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ অনুভব করলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সরকারী মনোভাবে পরিবর্ত্তন করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন সংস্কার বা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। আর একটি সত্য তিনি উপলব্ধি করলেন— শুধু মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর শক্তি সামর্থ বিনিয়োগের পক্ষে সংকীর্ণ ক্ষেত্র। তিনি আরও বুঝলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপদ কক্ষে তাঁর ওজস্বিনী-ভাষায় বক্তৃতা করবার শক্তির অপচয়ই হচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে যাছে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। ফলে তিনি রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করা স্থির করলেন। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তিনি বঙ্গীয় আইনসভায় সদস্য নির্বাচিত হন। এক বৎসর পরে কংগ্রেসের নির্দেশেই তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নববিধানে গঠিত বঙ্গীয় আইনসভায় সভ্য মনোনীত হ'ন।

"এই সময় তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল, বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল, বঙ্গীয় জননিরাপত্তা বিল প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৯৩২ সালে তিনি তিন আইন অনুসারে বন্দী শ্রী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্যের আশঙ্কাজনক অবস্থা সম্পর্কে আইনসভায় মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।" (মৈত্রী)

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন, ইংরাজ সরকারের প্রশ্রয় পেয়ে মুসলিম লীগের নেতারা চারদিক থেকে বাংলায় সংখ্যালঘু হিন্দু স্বার্থ ধ্বংস করতে উদ্যত। বাংলায় সংখ্যাগরীয়ান সম্প্রদায়ের নেতা হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিমদের কোন কর্তৃত্ব নেই—এই অজুহাতে তাঁরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে লাগলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁরা অনেক কিছু মিথ্যা রটনা করতে লাগলেন। শ্যামাপ্রসাদ বীরদর্পে তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের কোন দান বা সহায়তা নেই। অথচ সহৃদয় শিক্ষানুরাগী হিন্দুদের লক্ষ লক্ষ টাকা দান, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ছাত্রদের জন্য ব্যয় করা হয়। বাস্তবে সাধারণভাবে মুসলমান

সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষায় অনুন্নত থাকার জন্যই কর্ত্তৃত্ব লাভের সুযোগ হয়নি— আইন অনুসারে কর্ত্তৃত্ব লাভে কোন বাধা ছিল না।

হিন্দুমহাসভায় যোগদান

মুসলিম লীগের বিরোধিতার মুখে বৃহত্তর হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি হিন্দুমহাসভায় সক্রিয় সভাপতি রূপে যোগদান করলেন। এই সময় মুসলিম লীগ নেতারা মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ গঠন ক'রে তা'তে নিজেদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি হ্রাস করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ দেশব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি ক'রে মুসলিম লীগ নেতাদের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হ'তে দেননি।

১৯৪১ সালে কৃষক প্রজা পার্টির জনপ্রিয় নেতা এ.কে. ফজলুল হক হিন্দু মুসলমানের নানা দলের মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। এই মন্ত্রীসভাকে 'প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা" বলা হতো। এই মন্ত্রী-সভায় শ্যামাপ্রসাদ অর্থমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলেন। এই সময় হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন ভাগলপুরে হওয়ার কথা ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, বিহারের গভর্ণর সভার অধিবেশন বে-আইনি ব'লে ঘোষণা করলেন। শ্যামাপ্রসাদ সেই নিষেধাজ্ঞা মানলেন না। তার ফলে বাংলার মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

শ্যামাপ্রসাদ লক্ষ্য করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুরা ছাড়া ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেদের জীবনপণ সহযোগিতা নেই। তিনি মনে করতেন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরই কঠোর সংগ্রাম করে, সর্বস্ব উৎসর্গ ক'রে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। হিন্দু মহাসভার মধ্য দিয়ে তিনি সেই সংগ্রামকে কঠোরতর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁর ছিল না। তিনি বলতেন— 'সংগ্রাম আমরাই করবো, কিন্তু জয়লাভ করলে তার সুফল সকলের সঙ্গে ভাগ করেই ভোগ করবো।" হিন্দু মহাসভার বিলাসপুর অধিবেশনে তিনি বলেছিলেন ঃ

"হিন্দুজাতি অমর। বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে তারা তাঁদের অমূল্য ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়েছে। আত্মবিস্মৃতির অবসান ঘটলে তাদের শক্তি ও জাতীয় একতার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা. স্বাধীনতা লাভ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু এই স্বাধীনতা তাদের একচেটিয়া সম্পত্তি থাকতে পারে না। দেশের অন্য সকল সম্প্রদায়কে এই স্বাধীনতার অংশভাগী করতে হবে। সংকীর্ণ দলাদলির ভাব, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এবং দলগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আমাদের মন থেকে যেন চিরতরে তিরোহিত হয়।" (হিন্দু মহাসভা সভাপতির অভিভাষণ। বিলাসপুর ১৯৪৪।)

বাংলায় প্রগতিশীল যুক্তমোর্চার মন্ত্রিত্ব ও মেদিনীপুরের বিপর্যয় ঃ প্রতিবাদী শ্যামাপ্রসাদ

১৯৪২ সাল অগাস্ট আন্দোলনের বৎসর। বঙ্গদেশে এই আন্দোলন সবচেয়ে প্রবল হয়েছিল মেদিনীপুরে। তার ফলে ইংরেজ সরকার নির্মমভাবে মেদিনীপুরবাসীদের নির্যাতন করতে লাগলো। এমন নিষ্ঠুর নির্যাতন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে বিধাতাও যেন ইংরাজের পক্ষে যোগ দিলেন। প্রবল ঝড় ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে মেদিনীপুরের অনেক অংশ ধ্বংস হয়ে গেল। মেদিনীপুরবাসীদের তখন চরম বিপদ। কিন্তু সরকারী নির্যাতন সমভাবেই নির্বিচারে চলতে লাগলো। বিপন্ন মেদিনীপুরের উপর সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদ প্রথমে কাতর আবেদন, পরে সিংহগর্জনে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদে সরকার কর্ণপাতও করলো না। কেবল তাই নয়, এই সময়ে গভর্ণর জন হার্বার্ট সাহেব ইচ্ছামত শাসনকার্য চালাতে লাগলেন। মন্ত্রীসভার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকলো না। শ্যামাপ্রসাদ গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট ও বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে পত্র দিয়ে দেশের ভীষণ অবস্থার কথা বুঝিয়ে সতর্ক ক'রে দেন। কোন দিক থেকে কোন প্রতিকার না হওয়ায় শ্যামাপ্রসাদ প্রতিবাদে মন্ত্রীপদ ত্যাগ করলেন এবং মেদিনীপুরবাসীকে বন্যার ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচাবার জন্য দেশময় ছোটাছুটি করতে লাগলেন। কেন তিনি মন্ত্রীপদ ত্যাগ করলেন গভর্ণর হার্বার্টকে লিখিত পত্রে এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন ঃ—

"মিঃ ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের মিলন এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা যে সানন্দে গ্রহণ করতে পারেননি, একথা আর অবিদিত নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালনার যেটুকু সুযোগ আমাদের দেওয়া হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রাদায়ের প্রতিনিধিদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলায় তা কার্যকরী করবার লক্ষ্য সমগ্র বৃটিশ-ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম। এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'লে ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যই একমাত্র প্রতিবন্ধক ব'লে যে অজুহাত দেখানো হ'য়ে থাকে, তা' মিথ্যা প্রমাণিত হবে; বাবু আমলাতন্ত্র স্বভাবতই এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সত্য কথা বলতে কি, বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার প্রতি আপনার নিজের মনোভাব আদৌ সন্তোষজনক নয়। সময়-অসময়ে আপনি মুসলিম লীগকে সমর্থন করা প্রয়োজন ব'লে মনে করে থাকেন। মুসলিম লীগের পক্ষে আপনার এইরূপ বিশেষ ধরনের ওকালতির ফলে সময়ে সময়ে আমরা আপনাকে এই

প্রদেশের একজন নিরপেক্ষ শাসন-তান্ত্রিক প্রধান হিসাবে মনে না ক'রে মুসলিম লীগের একজন অনুগত এবং বিশিষ্ট সমর্থক ব'লে মনে করতে বাধ্য হয়েছি। এই ব্যাপারটি আমাদের সকলের কাছে রহস্য-জনক ব'লে মনে হয়েছে।"

বড়লাট লিনলিথ্‌গোর নিকট তিনি এই সময়ে এক পত্র লেখেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন—"কংগ্রেসের সর্বশেষ প্রস্তাবে যে দাবী করা হয়েছে, তা' প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার দাবী। ভারতের বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতিতে সন্তুষ্ট এমন একজন লোকও এদেশে পাওয়া যাবে না। মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে আলোচনা চালাতে বৃটিশ সরকারের অস্বীকৃতি অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হ'তে পারে না।"

পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ দুর্গতের সেবায় শ্যামাপ্রসাদ

১৯৪৩ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চরমে উঠেছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে জাপানী আক্রমণের ভয়ে ভীত, মরিয়া ইংরাজ সরকার বাংলার খাদ্য-ভাণ্ডারে হাত দিল। শত্রু সৈন্য এই অঞ্চলে প্রবেশ করলেও যাতে খাদ্য দ্রব্য হাতে না পায় তার জন্য খাদ্যশস্য সরিয়ে ফেলা হল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দেওয়া হল। তখন বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতায় আসীন; দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনেও মন্ত্রীসভার সদস্যরা প্রতিকারের জন্য সঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এই সর্বনাশের মধ্যে তারা এবং তাদের ব্যবসায়ী-সহযোগী ও মজুতদার সমর্থকরা ক্ষমতা দখলে রাখা ও সুবিধাভোগে তৎপর হয়ে উঠলেন। সরকারী প্রচার অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শস্যহানি এই করাল দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল না, এই দুর্ভিক্ষের আসল কারণ শ্যামাপ্রসাদ প্রথম উদ্ঘাটিত করেছিলেন 'মনুষ্যসৃষ্ট' ব'লে।—প্রায় পঞ্চাশলক্ষ মানুষ এই মন্বন্তরে মারা যায়। — বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর পুনরাভিনয় হল। ইংরাজ ও মুসলিম লীগ সরকার দুর্ভিক্ষ নিবারণের কোন চেষ্টাই করলো না। পল্লীগ্রাম থেকে অসংখ্য নরনারী শহরে চলে আসতে লাগলো এবং অন্নাভাবে দলে দলে মানুষ পথে ঘাটে মারা যেতে লাগলো। শহরেই বা অন্ন কোথায়? তখন গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষ গরীব মুসলমান চাষী ও মজুর, তাদের প্রতিও লীগ মন্ত্রীসভা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি; ত'বে লীগের দলীয় তরফ থেকে শুধু দুর্ভিক্ষ পীড়িত মুসলমান জনসাধারণকে ত্রাণ ও সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। কংগ্রেসের তরফ থেকে জনসাধারণকে লীগ তহবিলে দানের অনুরোধ জানানো হ'ল এবং তাঁদের নেতা জি.ডি. বিরলা ঐ তহবিলে প্রচুর অর্থদান করলেন। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিও লীগের সাহায্যপুষ্ট

ত্রাণকমিটি গঠন ক'রে অন্যান্য সংগঠনগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

এই দুর্দিনে বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাহার ক্লিষ্ট মানুষকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৪ই জুলাই, ১৯৪৩, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি বল্লেন ঃ 'ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই সংবাদ পাঠানো হোক্ যে বাংলাকে খাদ্যশস্য থেকে বঞ্চিত করা এমন কি মিত্রশক্তির স্বার্থেরও পরিপন্থী। বাংলাকে খাদ্যসরবরাহ করা সামরিক ব্যবস্থার মতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব'লে মনে করতে হবে। কিন্তু উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষ যদি এতে অসম্মত হন, তবে মন্ত্রীমণ্ডলীর কর্ত্তব্য হবে সমস্ত দায়িত্ব পরিহার ক'রে পদত্যাগ করা। আমরা তখন দেখে নেব কেবল গভর্ণর এবং তাঁর কর্মচারী দল দ্বারা দেশের শান্তি বজায় রাখা এবং শাসনকার্য পরিচালনা কতখানি সম্ভব হয়।' সরকারী সাহায্য এবং দলীয় তহবিলের উপর ভরসা না রেখে তিনি Bengal Relief Committee গড়ে তুললেন। 'হিন্দু মহাসভা' নাম প্রথমে না ব্যবহার করা সত্ত্বেও সরকারী গোয়েন্দা রিপোর্টে লেখা আছে ঃ 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত হিন্দু মহাসভাই একমাত্র দল যারা সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের ত্রাণকার্যে এগিয়ে এসেছে এবং কোনওরূপ রাজনৈতিক মুনাফা লোটার কাজে লিপ্ত হয়নি।" (কেন্দ্রীয় সরকারের গোপন নথিপত্র থেকে) পরে ত্রাণকার্যের প্রধান দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ডের ভার বেঙ্গল রিলিফ কমিটি চালানোর পর শ্যামাপ্রসাদের উপর চাপ আসে নাম পরিবর্ত্তনের, ফলে ঐ কমিটি হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটিতে রূপান্তরিত হয়। ২৪টি জেলায় ২২৭ টি ত্রাণকেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং লক্ষ লক্ষ দুর্গত নরনারীকে ত্রাণ সামগ্রী সাহায্য দেওয়া হয়। অর্থের জন্য সর্বভারতীয় স্তরে শ্যামাপ্রসাদ যে আবেদন জানান তাতে ভারতের প্রতি অঞ্চলে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছিল। ১৯৪৩ সালের ২০শে ও ২৪শে সেপ্টেম্বর শ্যামাপ্রসাদ কলকাতায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। সরকার শ্যামাপ্রসাদের সমস্ত বক্তব্য, বক্তৃতা সেন্সর করে। তাঁর কর্মকাণ্ড এং প্রতিবাদের ফলে বাংলায় ও অন্যান্য প্রদেশে সরকার বিরুদ্ধ জনমত গড়ে উঠলো। এমন কি ভারতের বাইরেও সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি বাংলার দিকে আকর্ষিত হল। শ্যামাপ্রসাদের ভাষায়—সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি আজ বাংলার দিকে পড়েছে; ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল নিয়ে বিদেশে তিক্ত সমালোচনা হচ্ছে। তিনি আরও লিখলেন, 'সরকারী প্রচেষ্টা যে বেশী হচ্ছে তা নয়, তবে এই লাভ হয়েছে যে সারা বিশ্বের কাছে কর্ত্তৃপক্ষকে অবিরত জবাবদিহি করতে হচ্ছে। জনগণকে শাসন করার যারা দাবী রাখেন, জনগণের জীবন রক্ষার দায়িত্ব থেকে তাঁরা কিছুতেই অব্যাহতি পাবেন না।'

শ্যামাপ্রসাদের অক্লান্ত যুদ্ধের ফলে বৃটিশ সরকার ১৯৪৪ সালে অর্ডিনান্স জারি ক'রে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়। ১০.৪.১৯৪৫ প্রকাশিত রিপোর্টে স্বীকার করা হয় যে দুর্ভিক্ষ এড়াবার জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। শ্যামাপ্রসাদ এই রিপোর্টের অসংগতি ও অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে লেখেন ঃ "দুর্ভিক্ষ হবার কোন সংগত কারণ ছিল না। বৃটিশ শাসন, ভারত সরকার ও বাংলার মুসলিম লীগ সরকার পরস্পরের সহযোগিতা ক'রে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়েছেন।"

দুর্গত মানুষদের ত্রাণকার্য ছাড়াও শ্যামাপ্রসাদ দুর্ভিক্ষ চলাকালীন লেখা তাঁর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' গ্রন্থে এক নিষ্ঠুর বাস্তব চিত্র ও তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনিই প্রথম লিখেছেন—দুর্ভিক্ষ একদিনে আসেনি—করাল মন্বন্তর ধীরে ধীরে বাংলা গ্রাস করেছে। প্রতিকার চেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার চরম ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন দেশ-বিদেশের সৈন্য দলে দলে এসে বাংলা ভ'রে ফেলেছে সহস্র সহস্র শত্রুকে বন্দী করে আনা হচ্ছে,—তাদের বোঝা বাংলার কাঁধে চেপেছে, "বার্মা" থেকে অসংখ্য আশ্রয় প্রার্থী চলে আসছে, কল কারখানায় ভিন্ন প্রদেশ থেকে সংখ্যাতীত মজুর নিয়োগ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার তখনও মনে করছেন, বাংলা অবাধে সকলের অন্ন জুগিয়ে যাবে, কোন প্রকার অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই।' আধুনিক গবেষণায় শ্যামাপ্রসাদের লেখা এই অসামান্য তথসমৃদ্ধ প্রামাণ্য দলিলটির বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত সমর্থিত হয়েছে।

ভারত বিভাগ ঃ পশ্চিমবঙ্গের জন্ম ও শ্যামাপ্রসাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল, ইংরেজ শাসকদের বাধ্য হয়ে ভারত ছাড়ার সংকল্প নিতে হল। ১৯৪৫ সালটি, যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় সূচিত করলো। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বৃটিশ ভারত অভিযানের কাহিনী প্রকাশ, আই.এন.এ. নেতাদের বিচার ও তাঁদের মুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী আন্দোলন, নেতাজীর অন্তর্ধান কাহিনী, বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার পরাজয়—এই সব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাক্ষী হয়ে রইল। বৃটেনেও মহাযুদ্ধের পর সাধারণ নির্বাচন রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটে, শ্রমিক দল ক্ষমতাসীন হয়। — ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে প্রাদেশিক শাসন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবীতে নির্বাচন লড়লো, হিন্দু মহাসভা ভারত বিভাগের বিপক্ষে আর কংগ্রেস আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতাদের পক্ষে মামলা লড়া, ইত্যাদি কারণে জাতীয়তাবাদী আবেগের তুঙ্গাবস্থাকে সপক্ষে কাজে লাগিয়ে সাফল্য লাভ করলো। তখনও ভারতের স্বাধীনতা কি অবস্থায় আসবে তা নির্দ্ধারিত হয়নি। হিন্দু মহাসভার পথ ভোটারদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। ১৯৪৬-এর মার্চ মাসে বিলেত থেকে ক্যাবিনেট মিশন এল ভারতকে 'অখণ্ড' রাখার জন্য 'তিনখণ্ড' করার প্রস্তাব নিয়ে। এই প্রস্তাবে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দান করা হয়। কিন্তু প্রস্তাব অনুযায়ী অন্তবর্তী সরকার গড়া ও যোগদান এবং সংবিধান রচনার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিয়ে লীগ ও কংগ্রেসের মতভেদ হ'য়ে গেল। কংগ্রেস অন্তবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিল এবং লীগ যোগদানে বিরত থাকলো। ১৯৪৬ সারের ১৬ই অগাস্ট লীগ সারা ভারত ব্যাপী 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস পালনের ডাক দেয়। সেই দিন থেকে কলিকাতায়, নোয়াখালিতে এবং পরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সমস্যাসঙ্কুল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলিকাতায় শ্যামাপ্রসাদ ত্রাণকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। তখনও পর্যন্ত তিনি দেশভাগের সপক্ষে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি, উপরন্তু "বাংলার আইন সভায় তিনি মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভাকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ "ভুলে যাবেন না কলিকাতার এই হত্যালীলায় কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তিরাই দাঙ্গায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের শতকরা নব্বই জনই গরীব এবং নির্দোষ। নেতাদের যদি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে থাকে এবং তারা এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে থাকেন যা সামলাবার হিম্মৎ তাঁদের না থাকে, তা হলে এমন দিন আসবে যখন সাধারণ মানুষই ঘুরে দাঁড়াবে এবং নিজেরা পিষ্ট হবার বদলে নেতাদেরই পিষ্ট করে মারবে।"

(বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্যবিবরণী থেকে)

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী — মার্চে পাঞ্জাবে রক্তক্ষয়ী বর্বরোচিত দাঙ্গার ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে শেষ পেরেক পোঁতা হল। বিক্ষুব্ধ হিন্দু ও শিখরা এইবার পাঞ্জাব ভাগের দাবী তুললেন। এর কয়েকদিনের মধ্যেই কংগ্রেস কার্যত ভারত ভাগের দাবী ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেয়, ভারত বিভাগ বিরোধী শ্যামাপ্রসাদ পরিস্থিতির অনিবার্যতাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিলেন। তবে বাংলার পশ্চিম ভাগকে মুসলিম লীগের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য বাংলা ভাগের দাবী তুললেন। পাঞ্জাব ও বাংলায় সামান্য মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার ফলে ঐ দুটি প্রদেশই পাকিস্তান পন্থীরা দাবী করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ বাংলায় সংখ্যালঘু হিন্দুস্বার্থ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে বললেন ঃ "মুসলমানদের প্রতি আমার কোনই বিদ্বেষ ভাব নেই। আমরা তাদের উপর বৈরী ভাব পোষণ করি না কিংবা আধিপত্যও করতে চাই না। কিন্তু আমরা মুসলিম লীগের নীতির সমালোচনা করে থাকি— কেননা তাদের কার্যকলাপ সাধারণ ভারতবাসীর স্বার্থহানিকর বলেই আমরা মনে করি। পাকিস্তান সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে না। হিন্দু মহাসভা সকল সম্প্রদায়ের -বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে এবং তাদের সঙ্গে একত্রে মিলে সারা ভারতের মঙ্গলার্থে সঠিক জাতীয় নীতি গড়ে তুলতে আগ্রহী।" (হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ) কিন্তু মুসলিম লীগ শাসনে হিন্দুদের উপর অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও নির্যাতনে মর্মাহত শ্যামাপ্রসাদও শেষপর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন—পাকিস্তান হোক বা না হোক, বাংলার বর্তমান প্রাদেশিক সীমানার মধ্যেই আমরা দুটি আলাদা প্রদেশ গঠনের দাবী জানাচ্ছি। (তারকেশ্বর সম্মেলনে বাংলা বিভাগের সপক্ষে বক্তৃতার অংশ) ইতিমধ্যে 'যুক্ত বঙ্গ' পরিকল্পনা রীতিমত অগ্রসর হয়েছে। এই মতের সমর্থনে সুরাবর্দি কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতৃত্বকে, বিশেষ করে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়কে, সহযোগী পান। বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের অনুকূল এই প্রস্তাবের আসল সমর্থক ছিলেন বাংলার লাট ফ্রেডেরিক বারোজ। তিনি অখণ্ড বাংলা রাখার জন্য কিরণশঙ্কর রায়কে সুরাবর্দির সঙ্গে যৌথ মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানালেন। শুধু বারোজ নয়, বড়লাট মাউন্টব্যাটেনও ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। স্বাধীন যুক্তবঙ্গ কমনওয়েলথে যোগ দেবে এবং সমগ্র পূর্বাঞ্চলে কলিকাতা থাকবে বৃটিশ ধনতন্ত্রের প্রধান পাদপীঠ, এই আশ্বাসে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের আপত্তিতে ও শ্যামাপ্রসাদের যুক্তবঙ্গ বিরোধী জনমত গঠনের চাপে প্রদেশ কংগ্রেস তা করতে সাহস পেল না।

বারোজ লিখেছেন, শরৎচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লক ও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি বঙ্গ প্রদেশ ভাগের বিরোধী, কিন্তু সংখ্যাগুরু হিন্দু জনমত যুক্তবঙ্গ প্রস্তাবে রাজি নয়। এক কথায়, লীগ শাসনে বিপর্যস্ত, দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাঙালী হিন্দুরা শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে 'স্বাধীন বঙ্গ', যার অনিবার্য পরিণতি ছিল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি, পরিকল্পনার বিরোধিতা করে সফলতা অর্জন করেন। প্রধানত তাঁর আন্দোলন ও জনমত গঠনের ফলেই বাংলার পশ্চিমাংশ পাকিস্তানে যাওয়ার থেকে রক্ষা পায়। শ্যামাপ্রসাদ দীপ্তকণ্ঠে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'You partitioned India, and I partitioned Pakistan.'

(আপনারা ভারত বিভাগ করেছেন ঃ আর আমি পাকিস্তান বিভাগ করেছি)।

কেন্দ্রে জাতীয় সরকার ঃ শ্যামাপ্রসাদের যোগদান ও পদত্যাগ

শ্যামাপ্রসাদের সংসদীয় জীবন শুরু হয় ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস মনোনীত সদস্য হিসাবে। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন এবং ১৯৩১ সালে নির্দল প্রার্থী হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে ভারত শাসন সংস্কার আইন অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হয়ে নবগঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সাল থেকে হিন্দুমহাসভার নেতা হিসাবে সদস্য থাকেন। স্বাধীন ভারতে তাঁর সংসদীয় জীবনের কার্যকাল স্বল্প। ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদের সদস্য পদে ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট থেকে ১৯৫০ সালের ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত তিনি জওহর লাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বে গঠিত অন্তবর্ত্তিকালীন সরকারে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রীপদে যোগদান করেন। গণপরিষদে নেহরুর জাতীয় মন্ত্রীসভায় শিল্প মন্ত্রকে যোগদান করে ১৯৪৮ সালে শ্যামাপ্রসাদ যে মিশ্র শিল্পনীতি পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ করেন তা ভারতকে শিল্পায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে এক সুষ্ঠু চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির সাক্ষর রেখেছে। একাধিক বিশেষজ্ঞ মনে করেছেন যে ভারতের যে শিল্পোন্নত দেশগুলির কাছাকাছি পৌছাবার প্রচেষ্টা তার উপর শ্যামাপ্রসাদের মিশ্র শিল্পনীতির ইতিবাচক প্রভাব আছে। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। পরবর্ত্তিকালে ডঃ মেঘনাদ সাহার নিকট তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সহযোগিতা পান।

স্বাধীন ভারতে শিল্পায়নের গুরুত্ব তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁর

মন্ত্রীত্বের সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারীশিল্পের গোড়াপত্তন হয়। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন চণ্ডীগড়ের কাছে শতদ্রু নদীর উপর বাঁধ দিয়ে ভাকরা নাঙ্গাল প্রকল্প তৈরী হয়। পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর স্টীল কারখানা ও চিত্তরঞ্জনের লোকোমেটিভ ফ্যাক্টরী সিন্দ্রীর সার কারখানা গড়ে ওঠে তাঁরই মন্ত্রকের সহায়তায়। দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের বিশাল প্রকল্প পরিদর্শনে যেতেন শ্যামাপ্রসাদ স্বয়ং। একবার জানা গেল দামোদরে বাঁধ দেওয়ার কাজে কর্মরত ইঞ্জিনীয়াররা বরাদ্দ টাকার বেশি খরচ করে ফেলেছিলেন। কারণ বর্ষার পূর্বে বেশ কিছু কাজ এগিয়ে রাখতে না পারলে দামোদর ফুঁসে-ফুলে সব ভাসিয়ে দেবে!—এই কথা জানতে পেরে শ্যামাপ্রসাদ বহু চেষ্টায় বিশেষ বরাদ্দ করিয়ে সে অর্থ মঞ্জুর করান। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তাঁকে নবভারতের প্রধান এক রূপকার ব'লে এখন আর কেউ স্মরণ করেন না।

লোকসভায় শ্যামাপ্রসাদ প্রদত্ত বক্তৃতাবলীতে স্বাধীনতা ও অধিকারের নানা ব্যাখ্যা আছে। আবেগ, পাণ্ডিত্য, শাণিত অস্ত্রের মত তথ্যযুক্তির ব্যবহার করে তিনি সমগ্র সভাকক্ষকে অভিভূত করে রাখতেন। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতের নতুন সংবিধান গৃহীত হয় এবং ঐ বছরের শেষেই নেহরু Preventive Detention Act পাশ করিয়ে নেন। শ্যামাপ্রসাদ তার তীব্র প্রতিবাদ করেন, তাঁর বক্তব্য ছিল সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত ও গঠিত নতুন লোকসভার সদস্যরা বিতর্কের পর স্থির করবেন এ বিষয়ে কি করা উচিত। ১৯৫১ সালে নেহরু সরকার মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে (অনুচ্ছেদ ১৪, ১৯. ৩১) কতগুলি বিধিনিষেধমূলক শর্ত আরোপের জন্য First Constitution Amendment Bill আনেন। শ্যামাপ্রসাদ নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার ক্ষুণ্ণ করার স্বৈরতন্ত্রী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান ও নির্বাচিত পার্লামেন্ট গঠন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন।

শিল্পসমৃদ্ধ নবভারতগঠনের যত বড় স্বপ্নই তাঁর থাকুক না কেন, যত বিশাল পরিকল্পনা গঠন করুন, অন্যায়ের সঙ্গে তিনি কিছুতেই আপোষ করতে পারতেন না। কাশ্মীর প্রশ্ন এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের প্রতি ভারত সরকারের নীতির সঙ্গে সহমত হ'তে না পারার কারণে তিনি আড়াই বছরের মধ্যে নেহরু ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করলেন। পাকিস্তান সম্বন্ধে নীতি নির্দ্ধারণে প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দুর্বলতা শ্যামাপ্রসাদের অসহ্য বোধ হতে লাগল। নেহরু লিয়াকৎ আলি চুক্তিতে পাকিস্তানকে অযথা, অন্যায়ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে মনে ক'রে তিনি তা'তে সায় দিতে পারলেন না। হিন্দুস্তানের উদারতাকে পাকিস্তান দুর্বলতা মনে করে—অতএব 'উদারতায়

সংযমের প্রয়োজন'— এই ছিল তাঁর অভিমত। পূর্বপাকিস্তান থেকে উৎপীড়িত ও উৎখাত হয়ে এবং ধর্মনাশের ভয়ে দলে দলে ছিন্নমূল হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছিলেন। ভারত সরকার তাঁদের আশ্রয় দেবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে না চাওয়ায় শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর সহকর্মী ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীও একই সঙ্গে মন্ত্রীপদ ত্যাগ করেন। যে মন্ত্রীপদের জন্য বড় বড় নেতারা লালায়িত, অসহায় বাঙালীদের প্রতি অবিচারের জন্য ক্ষোভে দুঃখে তা' আনায়াসে ত্যাগ করে শ্যামাপ্রসাদ বাংলায় ফিরে এলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীপদ ত্যাগ করার বিবৃতিতে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন ঃ

"সাময়িক উত্তেজনার বশে আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি—ধীর মস্তিষ্কে বিবেচনার পরই আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। যাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আছে তাঁদের অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও আমার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পারিনি বলে আমি অতীব দুঃখিত। কোন ব্যক্তিগত কারণে আমি পদত্যাগ করিনি। আশা করি যাঁদের সঙ্গে আমার মতানৈক্য হয়েছে তাঁরা আমার অভিমত গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন, আমি যেমন অকুণ্ঠচিত্তে তাঁদের অভিমতের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছি, তাঁরাও তেমনি আমার অভিমতের মর্যাদা দেবেন।

পাকিস্তানের প্রতি আমাদের (ভারত সরকারের) নীতিতে আমি কখনও স্বস্তি অনুভব করিনি। আমাদের নীতি দুর্বল, দ্বিধা জড়িত ও সামঞ্জস্যহীন। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গে যে সব ঘটনা সংগঠিত হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের পূর্বের দুঃখ কষ্টের কোন তুলনাই হয় না। শুধু মানবিকতার দিক থেকেই নয়, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বংশানুক্রমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে আত্মত্যাগ করেছেন, যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, তারই ভিত্তিতে তাঁরা স্বাধীন ভারতের ক্রোড়ে আশ্রয় পাবার অধিকারী। দেশের যে নেতারা আজ আর বেঁচে নেই, যে যুবকেরা একদিন হাঁসিমুখে ফাঁসিকাঠ বরণ করেছেন, তাঁরাই স্বাধীন ভারতের কাছে আজ ন্যায় বিচার চাইছেন।"

উদ্বাস্তু সমস্যা, পুনর্বাসন ও শ্যামাপ্রসাদ

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জীবন ও সম্পত্তিনাশের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিরাপত্তা ও সম্মানরক্ষার তাগিদে বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে চলে আসতে শুরু করেন। দেশ ভাগের পরে সেই অভিনিষ্ক্রমণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা এই প্রদেশের সামাজিক—রাজনীতিক—আর্থনীতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কংগ্রেস

সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রুটিপূর্ণ ত্রাণ ও পুনর্বাসন নীতির সমালোচনা করতে থাকে। শ্যামাপ্রসাদও সরকারীনীতির সক্রিয় সমালোচকদের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৭ সাল ও ১৯৫১ সালের মধ্যে বিশেষভাবে উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে পড়েন। মন্ত্রী থাকা কালীন তিনি পাকিস্তান সরকারের হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অসদ ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে নিখিল বঙ্গ জাতীয় বণিকসভার বৈঠকে তিনি বাংলার শিল্পপতিদের উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতি উদার ও কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের অনুরোধ জানান। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, শরণার্থীরা বহিরাগত বা অনধিকার প্রবেশকারী নন। ভারতবিভাগ তাঁরা স্বেচ্ছায় মেনে নেননি; তাই তার দায়ভাগও তাঁদের একার নয়। তাঁদের রক্ষা ও রক্ষণের এক নৈতিক দায়বদ্ধতা আছে পশ্চিমবঙ্গের মানুযজনের। বাঙালী হিন্দুদের বলপূর্বক পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেবার প্রশ্নে তিনি বল্লভভাই প্যাটেলকে মনে করিয়ে দেন যে আগে জানা দরকার তাঁরা ফিরতে চান কিনা, পরে, যদি ফিরে যান, তবে তাঁদের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবেন। তিনি উল্লেখ করেন যে পূর্ববঙ্গ আগত শরণার্থীদের বিবরণ থেকে স্পষ্ট জানা যায়, পাকিস্তান সরকার সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু উচ্ছেদের পরিকল্পনা কি ভাবে কার্যকর করছে।

১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল ইন্দো-পাক চুক্তির প্রেক্ষিতে নীতিগত বিরোধিতার কারণে শ্যামাপ্রসাদ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯শে এপ্রিল, ১৯৫০ তিনি পদত্যাগ কারণসূচক বিবৃতিতে বলেন, যখন বাঙ্গালী হিন্দুরা দেশবিভাগ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে পাকিস্তানে তাঁরা পূর্ণ নাগরিকত্বের অধিকার ও সম্মান পাবেন, তবে যদি তাঁদের অস্তিত্বের সকট দেখা যায় তখন ভারত সরকার নিষ্ক্রিয় থাকবে না। এক্ষেত্রে তিনি ভারত সরকারে নৈতিক দায়িত্ব বোধের অভাবকে প্রশ্ন করেন। সংসদে বাংলার পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিতর্কে তিনি পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের বিপজ্জনক অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি তাঁদের দৈহিক-মানসিক নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিতে পারেনি। পূর্ববঙ্গের থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি একদল কর্মী নিযুক্ত করেন। ঐ পর্যবেক্ষকদের একটি সমীক্ষায় (৬. ৮. ১৯৫০) জানা যায় যে, ১৫, ৯০০ জন হিন্দুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, ৯০% পূর্ববঙ্গে ফিরে যেতে চাননি। ১০% বলেন, হয়ত তাঁরা ফিরে যেতে বাধ্য হবেন, তার মূল কারণ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের অসহনীয় অবস্থা।

১৯৫০ সালের ১১ই জুন কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে নিখিল বঙ্গ উদ্বাস্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে শ্যামাপ্রসাদ ১লা মে থেকে ৩১মে ১৯৫০ এর মধ্যে হিন্দুদের নিগ্রহের একটি তালিকা পেশ করেন। তিনি বলেন, বহু বাঙালী মুসলমান যাঁরা ভারত বিভাগের সময় স্বেচ্ছায় পূর্বপাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন, তাঁরাও অনেকে ফিরে আসতে শুরু করেছেন। সরকারী মতে ১৯৫০ এর জুনমাস পর্যন্ত আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৩৫ লক্ষ, শ্যামাপ্রসাদের পরিসংখ্যানে অন্তত ৫০ লক্ষ। পুনর্বাসনের যথাযথ সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেওয়া, এমন কি প্রয়োজনে পূর্বপাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ স্থান দাবী করে বাঙালী হিন্দুদের পুনর্বাসন দেওয়া এবং শান্তিপূর্ণভাবে জনসংখ্যা ও সম্পত্তি বিনিময় করার তিনি বারবার সুপারিশ করেন। তিনি আরও বলেন, দেশভাগের সময় পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে যদি জন ও সম্পত্তি বিনিময় আদর্শগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা কার্যকরী কেন হবে না? বিভিন্ন জায়গায় তিনি বলেছেন এবং দেখিয়েছেন, ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা এবং শরণার্থীদের প্রতি ন্যায্য নীতি ও পরিকল্পনার অভাবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষার থেকে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় এবং যুব সমাজের বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা। বঙ্গীয় পুনর্বসতি সংগঠনের সভাপতি হিসাবে তিনি ছিন্নমূল মানুষের জন্য একটি বিকল্প পুনর্বাসন পরিকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করেন, যার সহযোগী প্রণেতা ছিলেন ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

১৯৫১ সাল ব্যাপী শ্যামাপ্রসাদ শিয়ালদহ স্টেশান, বনগাঁ সীমান্ত, রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্প ও অন্যান্য উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করেন। মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বেশ কিছু শিবির পরিদর্শন ক'রে তিনি অভিযোগ পান যে উদ্বাস্তুদের সঠিক পরিসংখ্যা নেওয়া হচ্ছে না, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ প্রায় নেই, ডোল দেওয়ার পদ্ধতি দুর্নীতিযুক্ত এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের কর্মচারীদের ব্যবহার অমানবিক। বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংগঠন ও কলোনীর অধিবাসীরা নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী বিবৃত ক'রে এবং সরকারী উদাসীনতা ও দুর্নীতির অভিযোগ ক'রে শ্যামাপ্রসাদের হস্তক্ষেপ দাবী করে অজস্র চিঠি লিখেছেন। ১৯৫১ সালে Eviction of Persons in Unauthorized Occupation of Land Billএর সমালোচনা করে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে পুনরায় গৃহহীন করা কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্ত চরম বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, বিলটি ভুস্বামী শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রচিত হয়েছে। তাঁর এই সংক্রান্ত শেষ

প্রচেষ্টা উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব লাভের পক্ষে। ভারতের নাগরিকত্ব না পেলে এক বিপুল সংখ্যক নরনারী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেন এবং নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হবে, এই মর্মে তিনি নেহরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল ও বিধানচন্দ্র রায় কে চিঠি লেখেন। তিনি ভারত-পাক সম্পর্কের উল্লেখ করে বলেন যে উভয় রাষ্ট্রের শান্তি ও সৌহার্দ্যই তাঁর কাম্য। কিন্তু পাকিস্তানর শুরু থেকে তার স্বরূপ যে প্রকার, তেমনি চলতে থাকলে কখনই মৈত্রী সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে প্রকৃত মর্যাদাজনক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা চাই। সেই সময় বিভক্ত ভারতে একমাত্র পূর্বপাকিস্তানেই সংখ্যালঘু সমস্যা বিদ্যমান ছিল। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের উপর হামলা ও নির্যাতন এবং তাঁদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ও উচ্ছেদ করা, ভারত সীমান্তে সৈন্য হানা, প্রায়শঃ এই সব সংবাদ সংবাদপত্রে পরিবেশিত হ'ত। তিনি বলেন, উদ্বাস্তুরা যতদিন পর্যন্ত না নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করেন এবং স্বেচ্ছায় ফিরে গিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মর্যাদার সঙ্গে নিজ ভূমে পুনপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন, ততদিন পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষের প্রকৃত হৃদয় পরিবর্ত্তন ঘটেছে বলে তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন না।

জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিত্বপদে থেকে তিনি ঘোষণা করেন—স্বাধীনতা যখন এসেছে তখন তিনি হিন্দুমহাসভাকে জনহিতকর, সংস্কৃতিমূলক সংগঠনে পরিণত করায় আগ্রহী। কংগ্রেস দল তখন দেশের শাসনক্ষমতায় আসীন। শাসকদলের জনবিরোধী বিধিবিধান ও নীতি নির্দ্ধারণের ন্যায্য সমালোচনা করার জন্য শাসিত জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন অনুভব ক'রে তিনি People's Party নামে একটি দল গঠন করেন। দিল্লীতে বারোটি বিরোধী দলের এক সভায় স্থির হয় যে ঐ People's Party কেই একটি নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক দলরূপে গঠন করা হবে—তারই ফলে সর্বভারতীয় বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হল। শ্যামাপ্রসাদ জনসঙ্ঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে সমগ্র ভারতে সুসংহত জনমত গঠন, পদদলিত জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও সাধনার পুনরুজ্জীবনই এই নবগঠিত দলের উদ্দেশ্য।

১৯৫২ সালে স্বাধীনভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। এই নির্বাচন সংগ্রামে জনসংঘ লোক-সভায় তিনটি এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ষোলটি আসন লাভ করে। শ্যামাপ্রসাদ দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র

দলের প্রধান নেতা হিসাবে বিপুল ভোটে মৃগাঙ্কমোহন শূর (কংগ্রেস) এবং সাধন গুপ্ত (ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি)র' প্রার্থীদের পরাজিত করেন এবং লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। নবগঠিত লোকসভার কাজ শুরু হ'লে তিনি কংগ্রেস বিরোধী সব দলমিলিয়ে জাতীয় গণতন্ত্রী দল (National Democratic Party) নামে একটি স্বতন্ত্র সংসদীয় গোষ্ঠী গঠন করলেন। সকল দল তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বিরোধীপক্ষে অবিসংবাদী নেতা বলে স্বীকার ক'রে নিল। দেশের প্রবল প্রতাপান্বিত মন্ত্রী মহারথী জওহরলাল নেহরুর এত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সে পর্যন্ত আর দেখা যায়নি।

কাশ্মীর সমস্যা ও শ্যামাপ্রসাদ

সারা দেশে এবং সংসদে শ্যামাপ্রসাদ জীবনের শেষ সংগ্রাম করে যান কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে। ১৯৪৮ সালের ২৭ শে অক্টোবর পাকিস্তানী রাজাকরদের হাত থেকে জম্মু-কাশ্মীরকে রক্ষা করার জন্য ভারতচুক্তির সনদে সই করেছিলেন তদানীন্তন মহারাজা হরিসিং। ইতিমধ্যে জম্মু-কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানী হানাদাররা দখল ক'রে নেয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু কাশ্মীর সমস্যার (ইউনাইটেড নেশনসে) আন্তর্জাতিকীকরণ করেন। কাশ্মীরকে ভারতীয় সংবিধানে ৩৭০ ধারার রক্ষা-কবচ দেওয়া হয়—যদিও সেই অধিকার সম্পর্কে বলা হয় "অস্থায়ী এবং সাময়িক ব্যবস্থা"। ১৪ই অগাস্ট ১৯৪৭ প্রায় ৫০০ দেশীয় রাজ্য স্বেচ্ছায় ভারতভুক্ত হয়, কিন্তু তখন তাদের স্বাধিকার রক্ষার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সেই সব দেশীয় রাজ্য যে সার্বিক দলিলে দস্তখত করেছিল জম্মু-কাশ্মীরও তাই করেছিল, সে ক্ষেত্রে কেন ঐ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তার যুক্তি ও নীতি শ্যামাপ্রসাদ প্রশ্ন করেন। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সর্বতোভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক আইনসঙ্গত, নীতি নির্দ্ধারিত ও অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও কেন এবং কি ভাবে ঐ জায়গার জন্য বিশেষ সাংবিধানিক আইন থাকতে পারে—এই প্রশ্ন অন্যান্য বিরোধী দল রাখেন। আরও একটি প্রশ্ন জাতীয় জীবনে জ্বলন্ত থেকে যায়—কাশ্মীরীদের—আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গণভোটের অঙ্গীকার—গণভোটের প্রস্তাবটি ছিল শর্ত্তসাপেক্ষ-অধিকৃত অংশ ছেড়ে পাকিস্তান চলে যাবে এবং সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় গণভোট হবে এই সূত্রে যে কাশ্মীর পৃথক স্বাধীন দেশ হবে, না ভারতভুক্ত থাকবে। এই শর্ত্ত আজও অপূর্ণ রয়েছে।—এ শুধু কাশ্মীর উপত্যকার সমস্যা নয়, তার থেকে বিস্তারিত ও গভীরতর সমস্যা জম্মু ও লাদাখের মানুষদের। শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, "আমি জম্মু ও কাশ্মীরের বিভাজনে চাই না। দেশ বিভাজনের বিভীষিকা, আমাদের জানা আছে।"

কাশ্মীরের আত্মরক্ষার জন্য ভারত সরকার বহু অর্থব্যয় করতে লাগলেন, অথচ অন্যান্য প্রদেশের মত ঐ অঞ্চল কখনই সম্পূর্ণভাবে ভারতভুক্ত হল না। জম্মু-কাশ্মীরের প্রজাপরিষদ ভারতের অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিল, আর কাশ্মীরের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (তখন এইভাবেই বলা হ'ত) শেখ আবদুল্লা চেয়েছিলেন স্বাধীন পৃথক রাষ্ট্র। অথচ সঙ্কটের সময় তিনি ভারত সরকারের সর্বাঙ্গীন সহায়তাও প্রত্যাশা করতেন। শ্যামাপ্রসাদ ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের এইরকম সম্পর্ক অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক মনে করেছিলেন। তিনি জম্মু-কাশ্মীরের প্রজাপরিষদের নীতিকে খোলাখুলি সমর্থন জানালেন। ফলে সমস্যা সমাধানের সূত্র আবিষ্কার ও অর্থবহ প্রচেষ্টার পূর্বেই নেহরুর সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর মতবিরোধ ঘটলো। শ্যামাপ্রসাদ পণ্ডিত নেহরুকে এক পত্রে লেখেন—"জম্মু-কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়ানের অংশ। সুতরাং ঐ রাজ্য সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং তার উপর লক্ষ্য রাখবার অধিকার ভারতের জনসাধারণের আছে। জম্মুর অধিবাসীরা জিজ্ঞাসা করছেন, ভারতের অন্যান্য অংশ যে শাসনবিধি দ্বারা শাসিত হচ্ছে, সেই একই সংবিধান অনুসারে তাঁদেরও শাসনকার্য পরিচালিত হবে কি না? তাঁরা আরও জানতে চান যে মুসলিম প্রধান কাশ্মীর উপত্যকার মানুষেরা যদি ভিন্নমত পোষণ করেন (ভারতীয় সংবিধান না মানেন) তবে তার জন্য জম্মু-বাসীরা কেন বিপদের সম্মুখীন হবেন। বাস্তবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে-আপনি ও শেখ আবদুল্লা কাশ্মীর বিভাগ (অর্থাৎ পাকিস্তান অধিকৃত 'আজাদ' কাশ্মীরের অস্তিত্ব) স্বীকার করেন কি না। আপনি বরাবরই এই জরুরী প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছেন।

অন্যদিকে প্রজাপরিষদ চাইছে যে সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতীয় সংবিধান দ্বারা শাসিত হোক। একে কি সাম্প্রদায়িকতা বলে? ভারতের বাকি সকল অংশে যখন ভারতীয় সংবিধান প্রয়োগ যোগ্য বিবেচিত হয়, তবে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে তা' প্রযুক্ত হবে না কেন?

সংসদে কাশ্মীর সংক্রান্ত বিতর্কে বারবার শ্যামাপ্রসাদ অকাট্য যুক্তি ও তথ্য দিয়ে নেহরু সরকারের নীতির সমালোচনা করেছেন। ৭ই অগাস্ট, ১৯৫২'র বিতর্কে আবার তিনি শাণিত যুক্তি সহকারে তাঁর মত তুলে ধরেন—কাশ্মীর যখন ভারতের অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ তখন কি করে একদেশে দুই সংবিধান, দুই পতাকা দুই প্রধান থাকবে?—এ সব প্রশ্নের কোন সদুত্তর তিনি কখনই পান নি। শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে প্রকাশ্য আন্দোলন ক'রে জনমত সংগঠন করবেন। দিল্লীর চাঁদনীচকে শোভাযাত্রার উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে তাঁকে মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় গ্রেপ্তার করা হয় ও বন্দী করা হয়। পরে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

বন্দী অবস্থায় জীবনাবসান

ভুললে চলবে না যে, শ্যামাপ্রসাদ তখন ভারতীয় জনসংঘের সভাপতি, লোকসভার নির্বাচিত সদস্য, বিরোধী দলের নেতৃস্বরূপ। কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু এবং শেখ আবদুল্লার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ একাধিক পত্র বিনিময় করেন; কিন্তু তা'তে তিনি সেখানকার সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সন্তোষজনক উত্তর পাননি এবং কাশ্মীর নীতি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে উক্ত দুই নেতার সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য মতান্তর ছিল। অবশেষে ৮.৫.'৫৩ তারিখে শ্যামাপ্রসাদ শেখ আবদুল্লাকে টেলিগ্রাম করেন যে তিনি নিজে কাশ্মীর গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি দেখার ও শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। সেই সঙ্গে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করারও আগ্রহ জানান; পণ্ডিত নেহরুকে একই সঙ্গে এই টেলিগ্রামের কপি পাঠান। যাত্রাপথে ৯ই মে শ্যামাপ্রসাদ শেখ আবদুল্লার উত্তর পান এই ব'লে যে শ্যামাপ্রসাদের কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা সময়োপযোগী নয় এবং তাঁর উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হবে না— কিন্তু এটি সরাসরি নিষেধ করা নয়। নেহরু কিছু জানাননি। সে সময় কাশ্মীর প্রবেশের জন্য ভারতসরকারের অনুমতিপত্র বা 'পারমিট' নেওয়ার আইন বলবৎ ছিল। তাই শ্যামাপ্রসাদের মনেও সংশয় ছিল, যেহেতু তিনি অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে কাশ্মীর প্রবেশ করতে চলেছেন তাই ভারতসরকার আইনত তাঁকে বাধা দিতে বা গ্রেপ্তার করতে পারেন। এই কারণে শ্যামাপ্রসাদ গ্রেপ্তার হওয়ার পর জনসাধারণেরও ধারণা ছিল যে 'পারমিট' নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রকৃত ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। পারমিট আইন ভঙ্গের কারণে শ্যামাপ্রসাদকে বন্দী করা হয়নি। এই আইন প্রয়োগ করার অধিকার ছিল ভারত সরকারের; কিন্তু তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কাশ্মীর সরকারের হাতে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় কাশ্মীর সরকার তাঁকে Public Security Act-এর বিশেষ ধারা অনুযায়ী বন্দী করেছিল— পারমিট আইনের কোন উল্লেখ সেখানে নেই। উপরন্তু ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাকে কাশ্মীরে প্রবেশ করার জন্য অযাচিত সাহায্য করা হয়। ১১ই মে শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর সঙ্গীরা যখন কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করার পূর্বে পাঠানকোট পৌঁছান তখন সেখানে গুরুদাসপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে জানান যে তিনি সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী, 'পারমিট' না থাকলেও তাঁদের কাশ্মীরে প্রবেশ করায় বাধা দেবেন না, এমন কি যাত্রার জন্য সাহায্য করতেও আগ্রহ প্রকাশ করেন। একজন সরকারী অফিসার তাঁদের রাভি নদীর ধারে সীমান্ত শহর মাধোপুর চেক্‌পোস্ট পর্যন্ত জীপে নিয়ে

যান। রাভি নদীর উপর ব্রিজের মাঝামাঝি পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার পরই সেখানে অপেক্ষারত জম্মুর পুলিশ কমিশনার, কাশ্মীরের Chief Secretary এবং Inspector General of Policএর সই কার দুটি অর্ডার দেখিয়ে শ্যামাপ্রসাদ কে গ্রেপ্তার করেন। —একটি অর্ডার ১০ই মে, অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে ঢোকার আগের দিন জারি করা, দ্বিতীয় পরোয়ানায় লেখা জম্মু-কাশ্মীরের, নিরাপত্তা ও শান্তি হানি করায় উদ্যত ব'লে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল! অর্থাৎ, তিনি কাশ্মীরে প্রবেশের পূর্বেই ঐ পরোয়ানাগুলি প্রস্তুত করা হয়েছিল। কাশ্মীর সরকার শ্রীনগরের কেন্দ্রীয় জেলখানার সুপারিন্টেডেন্ট কে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদকে যেন দু' মাস বন্দী করে রাখা হয়। এইভাবে ভারত সরকারের সুস্পষ্ট সহায়তায় কাশ্মীর সরকারের হাতে শ্যামাপ্রসাদ গ্রেপ্তার হলেন। দু'টি কারণে বন্দিত্বের সময় দু'মাস নির্দিষ্ট করা হয় ঃ (১) পণ্ডিত নেহরুর ইংল্যান্ড রানীর রাজ্যাভিষেকের উৎসবে যোগ দিয়ে দু'মাস পরে ফেরার কথা ; (২) শ্যামাপ্রসাদ.(habeas corpus) সুপ্রীম কোর্টের রায়ে পূর্বে মুক্তি পান— জম্মু-কাশ্মীর ভারতের সুপ্রীম কোর্টের আওতার বাইরে, সুতরাং সেখনে তাঁকে বন্দী করায় বাধা নেই! তা' না হলে দিল্লীতে বিচারাধীন মামলার শুনানী শুরু হ'লে শ্যামাপ্রসাদকে ছেড়ে দিতে হ'ত। ইতিমধ্যে দিল্লীতেও সংশ্লিষ্ট লোকজন মালমা যা'তে কোর্টে না ওঠে তার ব্যবস্থা করলেন—শুনানী মুলতুবী থাকলো ১৫ই জুলাই পর্যন্ত।

এই দুরভিসন্ধির জের টেনে স্বয়ং শেখ আবদুল্লা শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বিবৃতি দেন যে নেহরু ফিরে এলেই তাঁকে দিল্লি পাঠাবার কথা সরকার পক্ষ থেকে স্থির ছিল। নেহরুও ফিরে এসে এই কথার সমর্থন করেন। ত'তদিনে অবশ্য যা' সর্বনাশ হওয়ার হয়ে গিয়েছে শুধু তথ্যগুলি যৌথ ষড়যন্ত্রের দিকে আঙ্গুল দেখায়।— শ্যামাপ্রসাদ গ্রেপ্তারের পরেই একটি নোটে লিখে যান, যে ভাবে ভারতসরকারের অফিসাররা তাঁর কাশ্মীর প্রবেশ সুগম করেন (এবং কাশ্মীর সরকার গ্রেপ্তারী পরওয়ানা নিয়ে তৈরী ছিল) তা'তে ভারত সরকার ও কাশ্মীর সরকারের মধ্যে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়। —তাঁকে গ্রেপ্তার করার পর অর্ডিনান্স প্রচার করে কাশ্মীর সরকার ও আইন করে যে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে গেলে পারমিট লাগবে! ১১ই মে গ্রেপ্তারের পর শ্যামাপ্রসাদের আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে হিমালয়ের পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে (২৫০ মাইল রাস্তা) রাত্রি দুটোয় শ্রীনগরে নিয়ে যাওয়া হয়।—তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের ডাল লেকের প্রান্তে একটি পরিত্যক্ত বাংলোয় রাখা হয়। তাঁদের চারজনের পক্ষে (শ্রী টেক চাঁদ, শ্রী বৈদ, গুত ডোগরা ও শ্যামাপ্রসাদ) জায়গা ছিল অত্যন্ত অপরিসর, বাইরে যাওয়ার অনুমতি

ছিল না, স্নানাগার ছিল একটি, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না, দশ/বারোজন সশস্ত্র প্রহরী দিনরাত পাহারায় থাকতো। প্রথম দু'চার দিনের মধ্যেই তাঁর ডান পায়ে ব্যথা, অক্ষুধা, সন্ধ্যার পর অল্প জ্বর আরম্ভ হয়, তার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। খাদ্য ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না তো বটেই, তাঁর অভ্যস্ত খাদ্যও থাকতো না। ছোট মেয়েকে অনুরোধ জানিয়ে দিল্লী থেকে বিস্কুট, নেসকাফে, ওফালটিন, আনিয়ে ছিলেন, লেখার কাগজ-খাতা, ইত্যাদিও। শেষ, অসুস্থতার আগে চা-কফি আর ভেজিটেব্‌ল্‌ স্যুপ ছাড়া আর কিছু খাননি। অথচ ইতিপূর্বে ডাক্তাররা স্থির করেছেন, তাঁর প্লুরিসি হয়েছে। ২২শে জুন সকালে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ও রাত্রি ২.২৫ মিঃ তাঁর জীবনাবসান হয়।—মাকে, বৌদিকে, পরিবারের সদস্যদের বাংলায় চিঠি দিতে পারতেন না, যিনি বাংলা সেনসর করবেন তাঁকে পাওয়া যায়নি। ইংরিজি চিঠিও অনিয়মিত, হারিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি আগাগোড়া চলছিল। ১০/১২ দিন কোন চিঠিই এল না। ছোট ছেলে দেবতোষ কে লেখা শেষ চিঠি কলকাতায় এল তাঁর মৃত্যুর ৪ দিন বাদে ২৬শে জুন, বাকি চিঠিগুলি পৌঁছায় ২৭শে জুন, তাঁর শেষকৃত্য হয়ে যাওয়ার ৪ দিন পর। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়কে 'কাশ্মীর পারমিট' দেওয়া হয়নি। হাসপাতালে যাওয়ার সময় সহ-বন্দীদের সঙ্গে যেতে দেওয়া হয়নি। হাসপাতালে সঙ্কটজনক অবস্থা বুঝেও শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধ রাখা হয়নি, শেষকালে তাঁর আইনজ্ঞকেও দেখা করতে দেওয়া হয়নি। প্রথম দিকে শ্যামাপ্রসাদ যখন পায়ে ব্যথা শ্বাসকষ্ট ও জ্বরের কথা জানান তখন (২৩/২৪) নেহরু তাঁর মন্ত্রী কৈলাসনাথ কাটজুকে নিয়ে শ্রীনগরে বিশ্রাম করছিলেন; তাঁরা কোন ব্যবস্থার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়নি। ২০শে জুন থেকে ২২শে জুন পর্যন্ত তাঁর শরীরের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে; পরবর্ত্তিকালে সংগৃহিত তথ্য থেকে জানা যায় তিনি বুকে যন্ত্রণা অস্বাভাবিক ঘাম এবং হাই টেম্পারেচার থেকে কষ্ট পাচ্ছিলেন; ড্রাই প্লুরিসি বলা সত্ত্বেও কোন রকম প্যাথলজিকাল টেস্ট বা এক্স-রে করানো হয়নি। পরে করোনারি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলা হয়। কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজনকে কোন খবর দেওয়ার চেষ্টা হয়নি। করোনারী অ্যাটাকের রোগীকে একটি ছোটগাড়ী ক'রে সরকারী হাসপাতালে (১২ মাইল দূরে) স্ত্রী-রোগের ওয়ার্ডে ভর্ত্তি করা হয়। প্রথম থেকে দু'জন ডাক্তার তাঁকে চিকিৎসা করছিলেন, শেষ সময়ে তাঁদের একজনও উপস্থিত ছিলেন না, এক হাউসসার্জেন ঐ সঙ্কটাপন্ন রোগীর 'চিকিৎসা' করেন! শ্যামাপ্রসাদ নিজে বাড়িতে পরিবার বর্গের নিকট টেলিগ্রাম করেন ২২শে জুন, তা'তে প্লুরিসির উল্লেখ আছে, হার্ট অ্যাটাকের উল্লেখ নেই—সেটি তাঁর মৃত্যু সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছাবার কিছু বাদে পৌঁছায় ২৩শে জুন, ১৯৫৩।

ভোর পৌনে ছ'টায় তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিচারক রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে আসে টেলিফোন। পরে দিল্লী মারফৎ টেলিফোনে কাশ্মীর থেকে বলা হয় 'ডঃ মুখার্জ্জী মারা গিয়েছেন, তাঁর মরদেহ কি হবে?—শেখ আবদুল্লা জানতে চান। ২৩শে বেলা ১১টা কাশ্মীরের হোমমিনিস্টার বক্সী গোলাম মহম্মদ ফোনে জানান শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ বেলা ৩টেয় কলকাতা পৌঁছাবে, এসে পৌঁছায় রাত্রি নটায়! দিনের বেলা পৌঁছালে প্রতিবাদের সুযোগ বাড়বে আশঙ্কায় হয়ত এই দেরী! তাঁর ব্যাগে (পরে পাঠানো) পাণ্ডুলিপি, ডায়েরি, নোটস্, ইত্যাদি সবকাগজ পত্রপাওয়া যায়নি, সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বহু অনুরোধেও সেগুলি ফিরে আসেনি।

বন্দী অবস্থায়, চিকিৎসায় অবহেলায়, রহস্যজনক পরিস্থিতিতে, নির্বান্ধব একাকী সর্বকালের এক মহান জীবন শেষ হ'য়ে গেল। সারা ভারত জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো, বাংলার ঘরে ঘরে উঠলো হাহাকার, রোষ গর্জন করে উঠলো, চোখের জলে আগুন ঝরলো। তাঁর আশি বৎসর বয়স্কা পুত্রহারা মাতা যোগমায়ী দেবী জওহরলাল নেহরুকে পত্রে লেখেন, 'আমি আমার প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে বিলাপ করছি না। স্বাধীন ভারতের এক নির্ভিক সন্তান বন্দী অবস্থায় বিনা বিচারে শোচনীয় এবং রহস্যজনক অবস্থার মৃত্যু বরণ করেছে। সেই মহান প্রয়াত বীরের মা হিসাবে আমি অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পূর্ণ অপক্ষপাত ও প্রাকশ্য তদন্ত দাবী করছি।........ সঠিক বিচার হোক, জনগণ সতর্ক হোক, যেন স্বাধীন ভারতে আর অন্য কোন জননীকে আমার মত দুঃসহ যন্ত্রণায় ও দুঃখে অশ্রুপাত করতে না হয়।' এম.আর. জয়াকর, জয়প্রকাশ নারায়ণ পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, সুচেতা কৃপালনী প্রমুখ, নেতারা সর্বভারতীয় স্তরে তদন্ত কমিশন গঠন করার দাবী করেন, লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের কথা তো বাদই দেওয়া গেল। নেহরু কোন পদক্ষেপ নেননি শুধু তাই নয়, তদন্তের প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করেননি, সে আজ-ইতিহাস। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর কারণ আজও অনুদ্ঘাটিত রয়ে গিয়েছে। ২৪ শে জুন দক্ষিণ কলকাতার আদিগঙ্গার তীরে কেওড়াতলায় তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত হয়। — লক্ষ লক্ষ মানুষ চোখের জলে তাঁদের প্রিয় নেতাকে বিদায় দেন। তাঁকে আর আমরা ফিরে পাব না, সকল অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রগর্জন চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

শ্যামাপ্রসাদের চরিত্রে দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। একটি অক্ষুন্ন ন্যায় নিষ্ঠা, অন্যটি অসামান্য হৃদয়বত্তা। এই দুইটি গুণই তাঁক স্বজাতি বৎসল, স্বদেশভক্ত

এবং জাতীয় সংগ্রামে বীরসিংহ ক'রে তুলেছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ন্যায় ও সত্যের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করেছেন— নিজের সকল স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্য সবই বিসর্জন দিয়েছেন। শিক্ষাব্রতীরূপে তাঁর হৃদয়বত্তার পরিচয় ছাত্র সমাজ নিশ্চয় পেয়েছিল। তাঁর মত ছাত্রবৎসল শিক্ষাব্রতী অতি দুর্লভ। দুঃস্থ, দুর্গতদের দুঃখ কষ্ট তাঁকে বিচলিত করতো। সেজন্য তিনি আশ্রিত-বৎসল, শরণাগত রক্ষক বলে নমস্য হয়েছেন। তাঁর হৃদয়বত্তার প্রকৃত দৃষ্টান্ত-পঞ্চাশের মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবায়, বিপন্ন, নির্যাতিত মেদিনীপুরবাসীদের জন্য ব্যাকুলতায় এবং উদ্বাস্তুগণের পুনর্বাসনের জন্য প্রচণ্ড চেষ্টায় আত্মনিবেদন।

শুধু অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করে ছিলেন তাই নয়, নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাবসায়, অক্লান্ত শ্রমনিষ্ঠা ও অদম্য উচ্চাকাঙ্খার বলে তিনি এমনই শক্তি অর্জন করেছিলেন যে বহু তথাকথিত প্রতিভাবানদের অক্লেশে অতিক্রম ক'রে গিয়েছিলেন। তাঁর বাগ্মীতা, তাঁর মনীষা, তাঁর চিন্তাশীলতা, যুক্তিনিষ্ঠা একান্ত একনিষ্ঠ অনুশীলনের ফল। বাংলার এক বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হ'য়ে জীবনের সকল সম্ভোগ, বিলাস, স্বাচ্ছ্যন্দ্য এমন কি বিশ্রাম পর্যন্ত ত্যাগ ক'রে, নিজের বা স্বপরিবারের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, অবিমিশ্রভাবে দেশ ও জাতির হিতের জন্য এমন ক'রে জীবন উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে বেশি নেই।

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন আজন্মসিদ্ধ নেতা— হয়ত তাঁর এই বিষয়ে উত্তরাধিকারের সংযোগ আছে। স্যার আশুতোষ ছিলেন বিরাট পুরুষ। হাইকোর্টের জজিয়াতি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বেশি দিন জীবিত ছিলেন না— তিনি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাকে সার্থকতা দান করার অবসর পাননি। পুত্র শ্যামাপ্রসাদ তাঁর বহু সঙ্কল্পকে সার্থকভাবে কার্যে পরিণত করে গিয়েছেন। বিরাট পুরুষের সন্তান বিরাট পুরুষ, অন্য দেশে সুলভ হতে পারে—আমাদের দেশে এমন সার্থক নিদর্শন আর নেই।

শ্যামাপ্রসাদ তরুণ বয়সেও প্রবীণ সমাজে নেতৃত্ব করেছেন। জাতীয় জীবনে যে ক্ষেত্রে তিনি জনতার মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, সেই ক্ষেত্রেই তিনি নায়কত্ব লাভ করেছেন। শ্রেষ্ঠ নেতার সৃজনী ও পালনী দুই শক্তিই ছিল তাঁর অসাধারণ। নব নব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন যেমন প্রতিষ্ঠা করতেন, বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তেমনি সেগুলিকে সক্রিয় রাখতেও পারতেন। যে কোন সমস্যার ক্ষিপ্র সমাধানে এবং যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সামঞ্জস্য সাধনে এমন অদ্ভুত শক্তি বহু প্রীবণতর নেতাদের জীবনেও দেখা যায় না। মীমাংসা-দেবতা সরস্বতীর মত তাঁর

কণ্ঠে যেন সদাসর্বদা বাস করতেন। লোকহিত ও পরোপকার তাঁর জীবনে প্রধান ধর্ম ছিল। তাঁর কাছে কত লোক যে কতভাবে উপকৃত হয়েছে, তার হিসাব নেই—উপচিকীর্ষা তাঁর সহজ ও অনায়াস মনোবৃত্তি ছিল, উপকৃতদের নামও তিনি মনে রাখতে পারতেন না। কারণ তিনি কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা ক'রে কখনও উপকার করতেন না।

অসাধারণ বাগ্মীতা তাঁকে লোককান্ত জননেতৃত্বের গৌরব দান করেছিল। তিনি রীতিমত একনিষ্ঠভাবে বাগ্মীতার অনুশীলন করেছিলেন। তাঁর বাগ্মীতা উচ্ছ্বাসময়, অলস বাগ্‌বিলাস বা মনোবেগের বিস্ফরণমাত্র ছিল না, তাঁর প্রত্যেকটি উক্তি ছিল যুক্তিগর্ভ, বিনা যুক্তিতে তিনি কখনও কণ্ঠ-রসনার শক্তির অপচয় করতেন না। বক্তব্যে সদাই যুক্তিপরম্পরা থাকতো এবং সযত্ন সংগৃহীত তথ্যরাজীর দ্বারা সমর্থিত হ'ত। বহুক্লেশ স্বীকার ক'রে তিনি নানা উৎস থেকে তথ্যসকল সংগ্রহ করতেন। অভ্রান্ত তথ্য সংকলনের উপর প্রতিষ্ঠিত, অখণ্ডনীয় যুক্তি পরম্পরায় সুগ্রথিত, তাঁর বক্তৃতা হ'ত জ্বলন্ত অগ্নিময়। শ্যামাপ্রসাদ বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দুস্থানী—তিন ভাষাতেই অনর্গল যুক্তিগর্ভ সাবলীল বক্তৃতা করতে পারতেন। সর্বভারতীয় নেতৃস্থান অধিকার করার ফলে তিনি হিন্দিতে বক্তৃতা করা অভ্যাস করেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদকে কেহ কেহ সাম্প্রদায়িকতার অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন। তাঁর উদার সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে সাম্প্রদায়িক ভাবনার স্থানমাত্র ছিল না। সম্প্রদায় বিশেষের জন্য অসঙ্গত দাবীই সাম্প্রদায়িকতা, কিন্তু কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি যদি অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার হয় তবে তার প্রতিকারের চেষ্টা করা কি সাম্প্রদায়িকতা? শ্যামাপ্রসাদ তার বেশি কিছু করেননি। রাজনীতিক মতবাদের সঙ্গে অমিল হওয়ার অজুহাতে যদি এই বহুগুণান্বিত কর্মবীর ও চিন্তানায়কের অবদান অস্বীকার করা হয়, অথবা, তাঁর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো হয়, তবে সেই সব মানুষদের সংকীর্ণচিত্ত, ক্ষুদ্রাশয় মনে করা ব্যতীত উপায় নেই। শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বের প্রধান কথা তাঁর অনন্য সাধারণ ত্যাগ, সাহস ও ন্যায় বোধ। কেবল দৈহিক বিশালতা ও উদাত্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বরের জন্য নয়, তাঁর অক্ষুব্ধ প্রকৃতিস্থতা, অনুদ্ধত গাম্ভীর্য, ধীরোদাত্ত স্বভাব, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বল অপরিসীম নির্ভিকতা, ধী শক্তির প্রখরতা ও দেশবাসীর জন্য নিঃস্বার্থ উৎকণ্ঠা ইত্যাদির জন্যই তিনি মহাস্থবির দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে কোন সংস্কারমুক্ত, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক যদি সে যুগের ইতিহাস রচনা করেন তবে সেই ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদের সাধনার কাহিনী বিরাট স্থান জুড়ে থাকবে আশা করবো।

শ্যামাপ্রসাদ

শুনিব না আর এ-জনারণ্যে সিংহের গর্জন,
এবে শিবাদল-কোলাহল শুধু শুনিব অনুক্ষণ!
হায়, দুর্ভাগা দরিদ্র-দেশ;
শেষ সম্বল হ'লো নিঃশেষ,
এখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসে কর প্রতপ্ত সমীরণ।

হায়রে, আজিকে গেল ফুরাইয়া বাঙ্গালার শেষ আশা,
মোদের কণ্ঠে সে ব্যথা জানাতে পাই নাই কোন ভাষা।
ন্যায়-সত্যের তরে অবিরাম,
কে করিবে আর হেথা সংগ্রাম?
দেশ-জননীর তরে কে করিবে জীবন-সমর্পণ?

পরিশিষ্ট - ১

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী

১৯০১ জুলাই ৬ ।। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও যোগমায়া দেবীর ৭৭ নম্বর রসা রোড (বর্তমানে আশুতোষ মুখার্জি রোড) বাসভবনে শ্যামাপ্রসাদের জন্ম।

১৯১৭ ।। ভবাণীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে জলপানি সহ ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি।

১৯২১ ।। স্নাতক-বি. এ. ইংরাজী (সাম্মানিক) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে সর্বোচ্চ স্থানাধিকার।

১৯২২ এপ্রিল ১৬।। সুধা দেবীর সঙ্গে পরিণয়।

১৯২৩ ।। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় ভাষা বিভাগে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে শীর্ষ স্থান অধিকার।

১৯২৪ ।। আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার। কলিকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট হিসাবে নাম নিবন্ধিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ফেলো, পিতৃবিয়োগ (২৫ মে), পিতার শূন্য স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য পদে মনোনীত।

১৯২৬ ।। আইন পাঠের উদ্দেশ্যে বিলেত যাত্রা-কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত Conference of Universities of the British Empire সম্মেলনে যোগদান (জুলাই)।

১৯২৭ ।। ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ।

১৯২৯ ।। কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

		কন্সটিটুয়েন্সি থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার কাউন্সিলে নির্বাচিত।
১৯৩০	।।	আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনায় কংগ্রেসের আইনসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ—নির্দল প্রার্থী রূপে পুনরায় নির্বাচিত।
১৯৩৩	।।	পত্নী বিয়োগ।
১৯৩৪-৩৮	।।	উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ইন্টার-ইউনিভার্সিটি বোর্ড-এর সদস্য ও পরে সভাপতি।
১৯৩৭	।।	বিশ্ববিদ্যালয় কন্সটিটুয়েন্সি থেকে প্রাদেশিক আইনসভার অ্যাসেমব্লিতে নির্বাচিত।
১৯৩৮	।।	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাম্মানিক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একই সময়ে সাম্মানিক এল.এল.ডি.ডিগ্রি প্রদান।
১৯৩৯	।।	বিপ্লবী বীর সাভারকারের সঙ্গে পরিচয়।
১৯৪০-৪৪	।।	নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যনির্বাহক সভাপতি, বঙ্গীয় প্রদেশিক হিন্দুসভার সভাপতি।
১৯৪১	।।	ডিসেম্বর ১১, ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভায় অর্থসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ।
ডিসেম্বর	।।	ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সভাপতিরূপে যোগ দিতে যাওয়ার পথে Defence of India Rules– এ গ্রেপ্তার ও পরে মুক্তিলাভ। ক্রিপস মিশন আলোচনায় যোগদান।
১৯৪২	।।	বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে চিঠি। কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত।
		অগাস্ট আন্দোলনে মেদিনীপুর এবং দেশের অন্যান্য জাফগায় সরকারী দমননীতি ও দেশবাসীর ওপর নির্যাতনের

প্রতিবাদে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ, গবর্ণরের কাছে প্রেরিত পদত্যাগ পত্রের প্রকাশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ।

১৯৪৩ ।। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলায় দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাসংঘ সংগঠন। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অমৃতসর অধিবেশনে সভাপতিত্ব। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সভাপতি (১৯৪৩-'৪৫)

১৯৪৪ ।। ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা "ন্যাশনালিস্ট" প্রকাশ ও সম্পাদনা।

১৯৪৬ ।। বঙ্গীয় বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে পুনর্নির্বাচিত। কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা কালে বিপন্নদের সাহায্যদান ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা। হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ড স্বেচ্ছাসেবক দল সংগঠন। বাংলা থেকে 'Constituent Assembly' গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গভূমি প্রস্তাবের বিরোধিতা। 'বাংলা ভাগের নায়ক'।

১৯৪৭ ।। স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভায় শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের ভারগ্রহণ। হিন্দু মহাসভাকে রাজনীতি পরিত্যাগ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ দান। মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৪৮ ।। মহাত্মা গান্ধির হত্যার পর হিন্দু মহাসভা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯৪৯ ।। হিন্দু মহাসভার মত পরিবর্তন ও পুনরায় রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায় মহাসভার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর থেকে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্ত ও মোগললায়নের পূত অস্তি গ্রহণ ও ১৯৫২ সালে সাঁচীতে নবনির্মিত স্তূপে সংস্থাপন।

১৯৫০ ।। নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু অনুসৃত পাক-ভারত নীতির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ। বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ।

১৯৫১ ।। জনসঙ্ঘ নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন ও তার সভাপতি পদ গ্রহণ।

১৯৫২ ।। দক্ষিণ কলিকাতা থেকে সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে প্রথম লোকসভার সদস্যপদ লাভ। লোকসভায় ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে বিরোধী দলের প্রতিষ্ঠা। বর্মা, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ, কানপুরে জনসঙ্ঘ সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯৫৩ ।। কাশ্মীর সমস্যা বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে বিরোধ। দিল্লীর চাঁদনীচকে শোভাযাত্রার ওপর প্রচারিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার ও কারাবরণ। পরে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে মুক্তিলাভ। ১১ই মে কাশ্মীরে প্রবেশ ও কাশ্মীর সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার। ২৩শে জুন শ্রীনগরে বন্দীদশায় মৃত্যু। ২৪শে জুন কলিকাতায় প্রেরিত মরদেহের অন্ত্যেষ্টি।
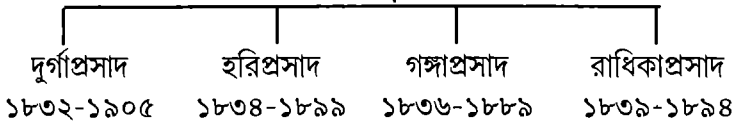
পরিশিষ্ট - ২

বংশ লতিকা
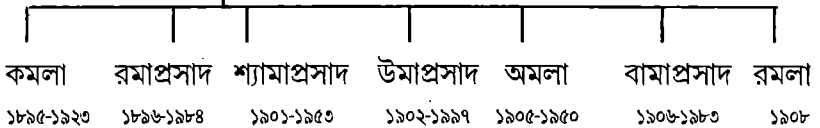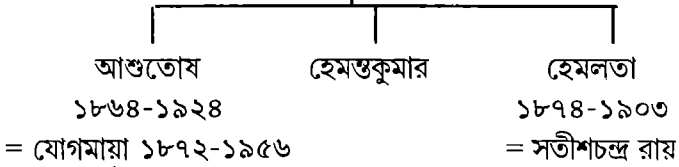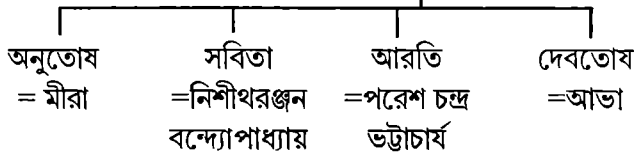
পরিশিষ্ট - ৩

কাশ্মীরের পথে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী তারাদেবীকে লিখিত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি।

করনাল
৯/৫
সকাল ৬ টা

ভাই বৌদি

কাল সকালে ট্রেনে দিল্লী ছাড়লাম। বেলা ২টায় আম্বালা পৌঁছলাম। পথে সব স্টেশনে হাজার হাজার লোক উপস্থিত ছিল। সে এক দৃশ্য যা জীবনে ভুলব না। না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আম্বালাতে মিটিং সেরে মোটরে ৫টায় বাহির হলাম। পথে দু জায়গায় বড় মিটিং হল। তারপর এখানে এলাম রাত আটটায়। রাত ১০টায় মিটিং শেষ হল। এখানে রাত কাটালাম। ছাদে শুয়েছিলাম, খুব বাতাস ছিল। ৭টায় এখন যাব পাণিপথে। সেই পাণিপথ, যেখানে ভারতের ভাগ্য ডুবেছিল। পাশে কুরুক্ষেত্র। ১০টায় ট্রেনে এগিয়ে চলব। জলন্দর যাব কাল ভোরে। তারপর অমৃতশহর সন্ধ্যায়। পরশু পাঠানকোট। পথে আটকাবে কি না জানি না। কাল আবদুল্লা ও জহরলালকে টেলিগ্রাম দিলাম। এখানে লোকের সাড়া দেখে অবাক হতে হয়।

হাসুকে একা রেখে এলাম- মন তাই খুব ব্যস্ত হয়ে আছে। উপায় কোন নেই। সে বলে, তার জন্য যেন না ভাবতে, একা বেশ থাকবে। যদি আমাকে জম্মু-কাশ্মীরে যেতে দেয়-তাহলে ১৪ই দিল্লী ফিরব। যদি ধরে তাহলে কি হবে জানি না।

তোমার চিঠি কবে পাব ঠিক নেই। ঠিকানা দিতে পারছি না-কোথায় কখন থাকব জানি না। আমি মাঝে মাঝে চিঠি দেব। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখে চম্‌কে উঠলাম। কত দূর-তারপর মনে হল তুমি কেমন আছ? গরম খুব? আর সব খবর কি? আমার ভালবাসা নিও। কোথায় কে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিজে বুঝি না। তবে যে কাজ নিয়েছি- তা ঠিক কাজ - এ বিশ্বাস না থাকলে এভাবে চলতে পারতাম না - বা এত হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ- সঙ্গে আসত না। তাই না?

এই থাক। এখন কি করছ তাই ভাবছি।

তোমার

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু

আমি গল্প লেখবার সঙ্কল্প করেছি। সংবাদ সত্য নয়। সময় পাব কোথায়? শরীরও ক্লান্ত। উপন্যাস লেখবার মত নিশ্চিন্ত অবকাশ শীঘ্র যে আমার জুটবে এমন আশা নেই। বঙ্গবাণীর আসর বেশ জমে উঠেচে-শরতের গল্প একটি পেয়েছ খুব ভাল হয়েছে। আমার অত্যন্ত অনবকাশের মাঝে মাঝে এক এক খানা ছোট ছোট গান লিখে ও সেই গান গেয়ে আমি নিজের মনে নিজের শ্রান্তি দূর করি। সেইরকমের একটি গান তোমাদের জন্যে পাঠাই, যদি ছাপাবার যোগ্য মনে কর তবে ছাপিয়ো।

তোমার বীণায় গান ছিল, আর
আমার ডালায় ফুল ছিল গো।
একই দখিন হাওয়ায় সেদিন
তোমায় আমায় দুল দিল গো।।
সেদিন সে ত জানে না কেউ
আকাশ ভরে' কিসের সে ঢেউ?
তোমার সুরের তরী আমার
রঙীন ফুলে কূল নিল গো।।
সেদিন আমার মনে হ'ল,
তোমার তানের তাল ধরে'
আমার প্রাণে ফুল ফোটানো
রইবে চিরকাল ধরে'।
গান তবু ত গেল ভেসে,
ফুল ফুরালো দিনের শেষে,

ফাগুন বেলায় মধুর খেলায়
কোন্‌খানে হায় ভুল ছিল গো।।

সুর থেকে বিচ্ছিন্ন গান আলোকহীন প্রদীপের মত— আমার নিজের মতে প্রকাশযোগ্য নয় শ্রাব্য পদার্থকে পাঠ্য বলে চালিয়ে দেওয়া উচিত হতে পারে না। কিন্তু এই গান ছাড়া আমার হাতে আর কিছু না থাকাতে এরই একটা এই নববর্ষের সওগাত স্বরূপে তোমাদের পাঠালুম। ইতি ১৫ বৈশাখ, ১৩৩০

শুভাকাঙ্খী
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বঙ্গবাণী" মাসিক পত্রিকায় গল্প লেখার অনুরোধ করেন শ্যামাপ্রসাদ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কবিগুরুর এই পত্র। কবিতাটি "বঙ্গবাণীর" ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে শ্যামাপ্রসাদ "বঙ্গবাণী"র জন্য লিখতে অনুরোধ করেছিলেন।

৪৫

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হয়েছি। তোমার বলিষ্ঠ চিত্ত, এই দুঃসহ শোককে উত্তীর্ণ হয়েও সান্ত্বনা পাবে সন্দেহ নেই। জীবনের সর্ব্বপ্রধান অভিজ্ঞতা মৃত্যুতে, সেই মৃত্যু যখন নিকটতম আত্মীয়ের ঘটে, তখন অন্তরের গভীরতম কক্ষ উদ্ঘাটিত হয় তার আঘাতে। সেইখান থেকে তুমি সেই বৈরাগ্যের বাণীকে লাভ করো যা ইহলোক ও পরলোকের মাঝখানে দৌত্যসাধন করে এই কামনা করি। ইতি ১৬ অগষ্ট ১৯৩৩

সম্ব্যথিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

৪৬

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রেণীতে আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে বলে দেশে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি করা হোলো। সাধারণের মধ্যে কথা উঠেছে এটা আমার পক্ষে অসঙ্গত ও অসম্মানকর। শাস্ত্রীমশায় সম্প্রতি কলকাতায় গিয়েছিলেন তিনি বললেন সেখানকার অধ্যাপক মহলেও এই মত, যে সকল দিক বিচার করে দেখলে আমার পদবী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো অধ্যাপকের চেয়েও নীচে পড়ে গেছে। আমি সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলে বিচার করতে পারিনে কিন্তু মোটের উপরে ব্যাপারটা সর্ব্বসাধারণে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেনি। আমার দেশের লোকে অনেকে আমার প্রতি নিষ্ঠুর, তাদের নির্ম্মতাকে জাগরূক করে তোলবার উপলক্ষ্য দিচ্চি বলে মন আমার সঙ্কোচ বোধ করচে। বুঝতে পারচি কঠিন প্রতিকূল দৃষ্টির সামনে আমাকে কাজ করতে হবে, পদে পদে অশান্তি ঘটবে- এমনতর অবস্থায় নিজের যোগ্যতা সপ্রমাণ করাও দুঃসাধ্য হবে। অতএব কি উপায়ে আমার শান্তি ও সম্মান যথোচিতভাবে রক্ষা হতে পারে সে কথা তোমাকেও আমার প্রতি মমতারক্ষা করে চিন্তা করতে হবে। আমার শরীর এখন ক্লান্ত, বন্ধুর পথে নিরন্তর আঘাত সহ্য করে চলবার শক্তি আমার নেই— এই কারণে শঙ্কিত হয়েছি। কি করা কর্ত্তব্য যথার্থ বন্ধুভাবে সে কথা চিন্তা কোরো পরামর্শ দিয়ো। দেশের কাছে আমার জীবনের যদি কোনোই মূল্য থাকে তবে যাতে আমার মান হানি ও শান্তি নষ্ট না হয় সে কথা চিন্তা করা তোমাদের কর্ত্তব্যই হবে। ইতি ২১ জুলাই ১৯৩২

তোমদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেবার অনুরোধ গ্রহণ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উত্তর

Senate House
Calcutta

D.O.No. 730 — 17th December 1936

My Dear Sir.

I am sorry for the delay in replaying to your very kind letter, agreeing to deliver the next Convocation Address. I was absent from Calcutta on several occasions during the last few weeks.

The University can certainly have no objection to your delivering the address in Bengali. There is however one difficulty which you will no doubt consider. We shall have among the members of the audience many who do not know Bengali. There will be such people among Members of the Senate, including His Excellency, Principals of colleges, guests and also students. If you finally decide to deliver your address in Bengali-and we shall abide by the choice which you may make-it will be desirable to have the English rendering of the address beforehand so that it may be printed and placed in the hands of those who do not know Bengali. Kindly consider this matter and let me know how you finally decide. We shall be glad to print the address in the University press according to your directions. The Convocation will be held on 13th February and I shall be grateful if a copy of the address (including the English translation, if you speak in Bengali.) is sent to me confidentially about three weeks before that date.

I wonder if any progress has been made with regard to the composition of the marching song. When will you be coming to Calcutta next time?

Yours
Syama Prasad Mookerjee

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্র

সামতা বেড়, পানিত্রাস
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু

শ্যামাপ্রসাদ, মন্মথবাবুকে তোমার কাছে পাঠালাম— সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক জানাবার জন্যে। বাবু আমার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং বহু দিনের বন্ধু। আমি যাকে-তাকে শ্রদ্ধা করি এ কথা কোন দিন লিখিনে, যদি না খুব ভালো করে জানি।

তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়া মানে আমার বিরুদ্ধে যাওয়া। আজ রমাপ্রসাদকে চিঠি লিখলাম, আবশ্যক মনে কর তো সে চিঠিও দেখতে পারো।

ব্রাহ্ম Conspiracyতে যোগ দিয়ে আমার বিরুদ্ধে যাবে এ আমি ভাবতেও পারিনে। আমি স্থানীয় লোক—সমস্ত ব্যাপার আগাগোড়া জানি।

Re ভাই প্রিয় মল্লিক মশায় মহৎ ব্যক্তি-মহৎ ব্যক্তিদের কাছে থেকে একটু দূ'রে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

তোমার সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে শীঘ্রই দেখা কোরব।

৪ঠা চৈত্র ১৩৩৬
তোমাদের
শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা কাজী নজরুল ইসলামের একটি পত্র

মধুপুর, ১৭. ৭. ৪২

শ্রীচরণেষু,

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। মধুপুর এসে অনেকে relief ও relacsation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়ত্ব সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর আমার ব্যবস্থা না করলে হয়ত কবি মধুসূদনের মত হাসপাতালে আমার মৃত্যু হ'ত। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পঙ্গু হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে। ওকে অনেক কষ্টে এখানে এনেছি। ওর অসুখের জন্যই এখনো সাত হাজার টাকার ঋণ আছে। এরমধ্যে মাড়োয়ারী ও কাবলিওয়লাদের ঋণই বেশী। হক্ সাহেব যখন আমার কাছে এসে কাঁদ্‌তে থাকেন যে, "আমায় রক্ষা কর, মুসলমান ছেলেরা রাস্তায় বেরুতে দিচ্ছে না।", আমি তখন মুসলিম লীগের ছাত্র ও তরুণদলের লীডারদের ডেকে তাদের শান্ত করি। তারপর Assembly-র সমস্ত মুসলমান মেম্বারদের কাছে আমি আবেদন করি। তাঁরা আমার আবেদন শুনলেন। ৭৪ জন মেম্বার হক্ সাহেবকে সমর্থন করতে রাজি হলেন। "নবযুগের" সম্পাদনার ভার যখন নিই, তার কিছুদিন আগে ফিল্‌মের music-direction-এর জন্য সাত হাজার টাকার কনট্র্যাক্ট্ পাই! হক্ সাহেব ও তাঁর অনেকে হিন্দু-মুসলমান supporters আমায় বলেন যে, তাঁরা ও ঋণ শোধ করে দেবেন। আমি Film-এর contract cancel করে দিই। পরে যখন দু'দিন মাস তাগাদা করে টাকা পেলাম না, তখন হক্ সাহেবকে বললাম "আপনি কোন ব্যাঙ্ক থেকে অল্প সুদে আমায় ঋণ করে দিন, আমার মাইনের অর্দ্ধেক প্রতি মাসে কেটে রাখবেন।" হক সাহেব খুশী হয়ে বললেন, "পনের দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করব।" তারপর সাতমাস কেটে গেল, আজ নয় কাল করে। তাঁর supporter-রাও উদাসীন হয়ে রইলেন। হিন্দু-মুসলিম ইউনিটির এক লাখ টাকা যখন মঞ্জুর হল, সে টাকা যখন হক্ সাহেব পেলেন, তখনো তিনি উদাসীন হয়ে রইলেন। আপনি জানেন, Secretariat-এ আপনার সামনে হক্ সাহেব বললেন, "কাজীর ঋণ শোধ করে দিতে হবে।" আপনিও

আমাকে বললেন, "ও হয়ে যাবে।" আমি নিশ্চিত মনে কাজ করব বললাম। আপনি জানেন, হিন্দু-মুসলমান unity-র জন্য আমি আমার কবিতায়, গানে, গদ্যে দেশবাসীকে আবেদন করেছি। সে লেখা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে— সে গান বাঙলার হাটে-ঘাটে, পল্লীতে, নগরে নগরে গীত হয়। আমি হিন্দু-মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছি। যদি হক্ মন্ত্রীত্ব ভেঙ্গে যায়, তা হবে আবার Coalition ministry-র জন্য। হক্ সাহেব একদিন বললেন, "কিসের টাকা?" আমি চুপ করে চলে এলাম। এরপর আর তাঁর কাছে যাইনি। আপনি Secretariat-এ যখন বলেছিলেন, "ও হয়ে যাবে" তখন থেকে স্থির বিশ্বাসে বসে রইলাম "আমি নিশ্চয়ই টাকা পাব।" এই Coalition ministry-র একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভাল্‌বাসি—আর কাউকে নয়। আমি জানি আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব। সেদিন বাঙালীর আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে— আপনারাই হবেন এদেশের সত্যকার নায়ক।

আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আমি জানি আমি Hindu-Muslim Unity Fund থেকে আমার ঋণমুক্তির টাকা পাব। আপনার কথা কখনো মিথ্যা হবে না। পাঁচশ' টাকা পেয়েছি। আরো পাঁচশ' টাকা অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র পারেন, পাঠিয়ে দেবেন বা যখন মধুপুরে আসবেন, নিয়ে আসবেন। কোর্টের ডিক্রির টাকা দিতে হবে। তিন চার মাস দিতে পারিনি। তারা হয়ত Body Warrant বের করবে। আপনার মহত্ত্ব, আমার উপর ভালোবাসা, আপনার নির্ভিকতা, শৌর্য্য, সাহস—আমার অণুপরমাণুতে অন্তরে বাহিরে মিশে রইল!

আমার আনন্দিত প্রণাম— পদ্ম শ্রীচরণে গ্রহণ করুন!

প্রণত
কাজী নজরুল ইসলাম

কি ব্যবস্থা করা যাবে সে বিষয়ে জুলফিকর হাইদারের সঙ্গে কথা হয়েছে। নজরুল সুস্থ হয়ে ফেরত আসে।

—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সংযোজন - ১

ইংরাজি থেকে বাংলায় অনুবাদ

সংসদে বিতর্ক (লোকসভা)
(দ্বিতীয় খণ্ড—প্রশ্নোত্তর বাদে অন্যান্য বিষয়)
বুধবার, ১৯ এপ্রিল, ১৯৫০
সভা শুরু ১০.৪৫ ঘটিকায়।
চেয়ারে অধ্যক্ষ
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী দ্বারা কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ-পরবর্তী বিবৃতি।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (পশ্চিমবঙ্গ) : স্যার, সংসদীয় রীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে আমার পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করে একটি বিবৃতি দেবার জন্য আমি আপনার সামনে দণ্ডায়মান। আমি এই সভাকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমি হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত নিইনি— গভীর ও দীর্ঘ চিন্তার ফলেই নিয়েছি। বহু মানুষ, যাঁরা আমাকে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছেন এবং যাঁদের আমি অত্যন্ত সম্মান করি, তাঁদের প্রতি আমি আমার দুঃখ ব্যক্ত করছি তাঁদের অনুরোধ রাখতে পারলাম না বলে। প্রায় আড়াই বছর ধরে আমি স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় কাজ করেছি এবং এই কাজে যথাসম্ভব পরিশ্রম করেছি। এর ফলে যে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি তা অত্যন্ত মূল্যবান। যে পরিমণ্ডলে আমি কাজ করেছি, যা ছিল দেশের একট যুগসন্ধিক্ষণে, তাতেও আমি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি। এই জন্য এই সদনের সঙ্গে সম্পর্কিত সব মানুষকে আমি ধন্যবাদ জানাই, তাঁরা আমার উপর যে বিশ্বাস রেখেছেন তার জন্য। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে, কারণ তাঁরা তাঁদের নেতৃত্বে দেশসেবা করার সুযোগ আমাকে দিয়েছেন। আমার এই পদত্যাগের মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো কিছু নেই। আমি এও আশা করি যে যাঁদের সঙ্গে আমার মতের মিল হয়নি তাঁরা আমার বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করবেন—যেমন আমি নির্দ্বিধচিত্তে তাঁদের বিশ্বাসকে সম্মান করেছি। আমার সঙ্গে (মন্ত্রীসভার) যে মতানৈক্য

(বর্তমানে) হয়েছে তা মৌলিক এবং এর পরে আমি সুবিচার ও আত্মসম্মান মাথায় রেখে এব্ং এক সরকারে থাকতে পারি না যার নীতি সমর্থন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি একথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব যে আমি যখন প্রধানমন্ত্রীকে ১ এপ্রিল তারিখে আমার পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত জানালাম (তখনো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী দিল্লি এসে পৌছন নি) তখন প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে আমার অবস্থান বুঝলেন, স্বীকার করলেন যে আমাদের মধ্যে গভীর মতানৈক্য আছে এবং আমাকে মন্ত্রীসভা থেকে যথাশীঘ্র ছেড়ে দিতেও সম্মত হলেন।

পাকিস্তানের প্রতি আমাদের যা মনোভাব তা নিয়ে আমি কখনোই সন্তুষ্ট ছিলাম না। এই মনোভাব দুর্বল, স্ববিরোধী এবং ক্রমাগত হোঁচট-খেয়ে-চলা। পাকিস্তান আমাদের এই ভালমানুষীকে দুর্বলতা হিসাবে দেখেছে। তার ফলে পাকিস্তান আরো সমস্যা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়েছে, আমাদেরকে আরো যন্ত্রণা দিয়েছে এবং আমাদের নিজেদের চোখে আমরা হেয় হয়েছি। প্রতিটি বিষয়ে আমরা রক্ষণাত্মক অবস্থানে থেকেছি এবং পাকিস্তানের কুমতলব মোকাবিলা করতে বা আবরণ সরিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু আজকে আমার বিচার্য বিষয় সার্বিক ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নয়। আমাকে পদত্যাগ করতে যা বাধ্য করেছে তা হল পাকিস্তানে, বিশেষত পূর্ববাংলায় সংখ্যালঘুদের প্রতি পাকিস্তানী আচরণ। একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন— বাংলার এই সমস্যা কোনো প্রাদেশিক সমস্যা নয়। এই সমস্যার থেকে সর্বভারতীয় কিছু বিষয় উঠে এসেছে, যার সমাধানের উপর গোটা দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি, সবই নির্ভর করছে। এ দেশের বেশিরভাগ মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ চেয়েছিলেন, যদিও একথা আমি আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করি যে একটি ছোট্ট অংশ, যাঁরা দেশপ্রেমিক এবং যাঁরা দেশের মঙ্গলকামনা করেন তাঁরা চাননি— এবং এজন্য তাঁদের কষ্টস্বীকারও করতে হয়েছিল। অপরপক্ষে হিন্দুরা কেউই দেশভাগ চাননি। যখন দেখা গেল দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী তখন আমি বাংলা ভাগ করার কাজে একটা বিশাল ভূমিকা পালন করেছিলাম। এর কারণ, তা না করলে গোটা বাংলা এবং সম্ভবত আসামও, পাকিস্তানে চলে যেত। তখন আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে আমি কোনোদিন দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য হতে পারি। (সেই সময়) আমি এবং অন্য অনেকে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের আশ্বাস দিয়েছিলাম যে যদি ভবিষ্যতে পাকিস্তান সরকার তাদের উপর অত্যাচার করে,

যদি তাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার না দেওয়া হয়, যদি তাদের জীবন এবং মানসম্মান বিপর্যস্ত হয় বা তাদের উপরে আক্রমণ হয় তাহলে স্বাধীন ভারত চুপ করে বসে তা দেখবে না— ভারতের সরকার এবং জনসাধারণের তাঁদের ব্যাপারে সাহসের সঙ্গে তৎপর হবে। গত আড়াই বছরে তারা যে যন্ত্রণা পেয়েছে তা যথেষ্ট ভয়াবহ। এবং আজকে আমার স্বীকার না করে উপায় নেই যে তাদের যে আশ্বাস আমি দিয়েছিলাম তা আমি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রাখতে পারিনি— এবং শুধু এজন্যই বর্তমান সরকারে থাকবার কোনো নৈতিক অধিকার আমার আর নেই। অতি সম্প্রতি পূর্ববাংলায় যে সব ঘটনা ঘটেছে তা অবশ্য তাদের গত আড়াই বছরের অত্যাচার ও অপমানকে ম্লান করে দিয়েছে। আমরা যেন ভুলে না যাই যে পূর্ববাংলার হিন্দুদের ভারতের কাছ থেকে সাহায্য পাবার যে-অধিকার আছে তা শুধু মানবিক কারণে নয়। তারা দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং বৌদ্ধিক প্রগতির জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্বার্থহীন ভাবে কাজ করে গেছেন। যে সব দেশনেতা আজ আমাদের মধ্যে নেই এবং যেসব যুবক দেশের স্বাধীনতার জন্য হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছেন তাঁরা আজ সম্মিলিত কণ্ঠে ন্যায়বিচার চাইছেন।

যে চুক্তি সই হয়েছে (৮ই এপ্রিলের নেহরু-লিয়াকত চুক্তি বা দিল্লি চুক্তি—৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তা আমার মতে মৌলিক সমস্যাটির কোনো সমাধানই করতে পারবে না। এই অমঙ্গলের মূল আরো অনেক গভীরে নিহিত—তাপ্পি মেরে কখনো শান্তি আসবে না। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য এবং মূলনীতিই হচ্ছে একটি ইসলামী রাষ্ট্র তৈরি করা এবং সেখান থেকে সমস্ত হিন্দু ও শিখকে বিতাড়িত বা হত্যা করা এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করা। এই মূলনীতির ফলে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে "বিপদসঙ্কুল, বীভৎস ও সংক্ষিপ্ত" ("nasty, brutish and short")। ইতিহাস যেন আমরা ভুলে না যাই। যদি যাই তাহলে তা আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে। আমি প্রাচীনকালের কথা বলছি না, কিন্তু যদি পাকিস্তান সৃষ্টির পরে সে দেশের ঘটনাপরম্পরার দিকে তাকিয়ে দেখা যায় তাহলে এটা পরিষ্কার হবে যে সেদেশে হিন্দুদের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ নেই। সমস্যাটা কিন্তু সাম্প্রদায়িক নয়, সমস্যাটা রাজনৈতিক। যে চুক্তি করা হল তাতে ইসলামীয় রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত স্বরূপটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি কেউ পাকিস্তানের সংবিধান-প্রণয়ন সভায়

পাশ করা লক্ষ্য প্রস্তাবটি (Objectives Resolution) মন দিয়ে পড়েন এবং সেই সঙ্গে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতাও মাথায় রাখেন তাহলে দেখবেন যে এক জায়গায় যেমনি সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে তেমনি আর এক জায়গায় সতেজে ঘোষণা করা হয়েছে, "ইসলামে যে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মমতা, সহনশীলতা এবং ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে তাও পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে"। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এই প্রস্তাব উত্থাপনের সময় নিম্নলিখিত বক্তব্য রেখেছিলেন।

"আপনারা এও লক্ষ্য করবেন যে যখন মুসলিমরা নিজেদের ধর্মাচরণ ও ধর্মপালন করছেন তখন রাষ্ট্রের ভূমিকা কিন্তু এক নিরপেক্ষ দর্শকের মতো হবে না। তা যদি হত তাহলে যেসব আদর্শের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান দাবী করা হয়েছিল প্রকারান্তরে সেসব আদর্শই নাকচ করে দেওয়া হত। যে রাষ্ট্র আমরা তৈরি করতে চাইছি তার ভিত্তি হবে সেই সব আদর্শই। রাষ্ট্র এমন একটা পরিবেশ তৈরি করবে যা এক প্রকৃত ইসলামী সমাজ গঠনে সহায়ক হবে— যার মানে হচ্ছে রাষ্ট্র এই ব্যাপারে এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কায়েদে আজম এবং মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতারা দ্বার্থহীনভাবে একথা ঘোষণা করেছিলেন যে মুসলিমদের এই পাকিস্তান দাবীর মূল কারণ, মুসলিমদের এক নিজস্ব জীবনশৈলী ও আচরণবিধি আছে। বাস্তবেই, ইসলাম সামাজিক আদানপ্রদানের জন্য একটি নিয়মাবলী বেঁধে দিয়েছে এবং সমাজ প্রতিনিয়ত যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় তাকে মোকাবিলা করার জন্য দিকনির্দেশও দিয়ে দিয়েছে। ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত আচরণ ও বিশ্বাসের ব্যাপার নয়"।[৩৪৪]

আমি প্রশ্ন রাখছি, এইরকম একটি সমাজে কি কোনো হিন্দু তার সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে?

আমাদের প্রধানমন্ত্রীই মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এই সদনে দাঁড়িয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মূল পার্থক্যটি বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করার যোগ্য:

"পাকিস্তানের মানুষ এবং আমরা একই জনগোষ্ঠীর। আমাদের দোষ ও গুণগুলিও এক। কিন্তু মূল সমস্যাটা হচ্ছে তারা যে ধর্মভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক সরকার গঠন করেছে তার সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ নিয়ে"।

যে মতাদর্শ পাকিস্তান প্রচার করেছে সেটাই আমাদের উদ্বেগের একমাত্র কারণ নয়। তারা যে আচরণ করেছে তা এই মতাদর্শের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর ফলে সে দেশের সংখ্যালঘুদের বহুবার ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ এবং আচরণ সম্বন্ধে খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই চুক্তিটি এই মৌলিক সমস্যার কোনো সমাধান দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

সাধারণ মানুষের স্মৃতিশক্তি অনেকক্ষেত্রেই অত্যন্ত দুর্বল। কিছু মানুষের ধারণা এই চুক্তিটিই সাম্প্রতিককালে সংখ্যালঘুর সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম বিরাট প্রচেষ্টা। আমি আপাতত পাঞ্জাবে যে কাণ্ড হয়েছিল তার কথা তুলছি না—যেখানে প্রশাসনের তরফে সবরকম আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও প্রশাসন সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়েছিল এবং শেষপর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়েছিল এক পৈশাচিক উপায়ে। তারপর আমরা দেখেছি পূর্ববাংলার উত্তরাংশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন। বর্তমানে পূর্ববাংলায় এককোটি ত্রিশ লক্ষ হিন্দু বসবাস করেন এবং এঁদের ভবিষ্যৎ ভারতে আমাদের সকলের কাছে এক মহা দুশ্চিন্তার বিষয়। ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাস থেকে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে পাঁচ লক্ষ হিন্দু পূর্ববাংলা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। কোনো বড়রকম ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে তাঁরা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাননি এবং আশ্রয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে ভারতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, কোনো মুসলিমকে ভারত ছেড়ে পাকিস্তান যেতে বাধ্য করা হয়নি, ভারতের তরফ থেকে কোনো প্ররোচনা দেবারও প্রশ্ন ওঠে না। ১৯৪৮ সালে প্রথম আন্তঃ-ডমিনিয়ন চুক্তি কলকাতায় স্বাক্ষরিত হয় যার বিষয় ছিল বিশেষ করে বাংলার সমস্যা। যদি কেউ সেই চুক্তি এবং বর্তমান চুক্তি তুলনা ও বিশ্লেষণ করে দেখেন তাহলে দেখবেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুটি চুক্তি প্রায় সমার্থক। কিন্তু এই (১৯৪৮ সালের) চুক্তি ফলদায়ক হয়নি। ভারত সেই চুক্তি মেনে চলেছে, কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে বহির্গমন অবারিত থেকেছে। প্রচুর আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, আমলা এবং মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠক হয়েছিল, দুই ডমিনিয়নের মন্ত্রীদের মধ্যেও কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু ফলের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, পাকিস্তানের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এরপর ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে দিল্লিতে একটি দ্বিতীয় আন্তঃ-ডমিনিয়ন বৈঠক হয়, আরো একটি চুক্তি সই হয়। বিষয় একই ছিল— অর্থাৎ বাংলার সংখ্যালঘুদের অধিকার। এটি প্রথম

চুক্তিটির একটি প্রতিলিপি ছিল বললেই হয়। এরপর ১৯৪৯ সালে আমরা দেখতে পাই পূর্ববাংলায় অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং আরো বেশি সংখ্যক অসহায় মানুষ তাদের ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ভারতে এসে পৌঁছচ্ছে। অর্থাৎ অস্বীকার করার উপায় নেই যে দু-দুটি আন্তঃ-ডমিনিয়ন চুক্তি সত্ত্বেও ষোল থেকে কুড়ি লক্ষ হিন্দু পূর্ববাংলা থেকে উৎখাত হয়ে ভারতে ঢুকেছে। আনুমানিক দশ লক্ষ হিন্দুকে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ থেকে ভারতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই সময় পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় বেশ কিছু মুসলিমও সেদেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বড়রকম ঘা খায় এবং আমাদের অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে এই বিয়োগান্ত নাটক দেখতে হয়।

আজকে লোকের মনে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে ভারত এবং পাকিস্তান, দুই দেশই নিজেদের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঘটনা কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদেশী সংবাদপত্রে এ ধরনের বিরূপ প্রচার করা হয়েছে। এটি ভারতের পক্ষে মানহানিকর এবং যাঁরা সত্য জানতে চান তাঁদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করা জরুরি। ভারত সরকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য—এই দুই পর্যায়ের শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে—অবশ্যই পাঞ্জাব এবং দিল্লির অবস্থা ঠাণ্ডা হবার পরে। এর মধ্যে পাকিস্তান কিন্তু সিন্ধু এবং পূর্ববাংলায় সংখ্যালঘুদের শান্তিতে থাকবার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে—এটি একটি গুরুতর এবং অবিরাম প্ররোচনাও বটে। এটা ভুললে চলবে না যে যাঁরা পূর্ববাংলা বা সিন্ধুপ্রদেশ থেকে চলে এলেন তাঁরা কিন্তু দেশভাগের সময়কার কোনো কাল্পনিক ভয় থেকে এ কাজ করেননি। এঁরা পাকিস্তানে থেকে যেতে চেয়েছিলেন, শুধু যদি তাদের শান্তিতে এবং সুস্থিতিতে সে দেশে থাকতে দেওয়া হত।

১৯৪৯ সালের শেষের দিকে নতুন করে পূর্ববাংলায় নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করে। সে অঞ্চলে একটা লৌহ যবনিকা টাঙানো ছিল, যার ফলে এর খবর প্রথম প্রথম ভারতে পৌঁছয়নি। ১৯৫০-এর জানুয়ারি মাসে যখন ১৫, ০০০ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে হাজির হয় তখনই নির্যাতন ও ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনী জানা যায়। এবার আক্রমণ হয়েছিল যুগপৎ শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং গ্রামের সেই সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে যারা সচল, চাঙ্গা এবং ঐক্যবদ্ধ। এদের বুকের অন্তস্থলে ভয় ধরিয়ে দেওয়াই ছিল পাকিস্তানের নীতি। এই ভয়ঙ্কর

খবরে পশ্চিমবঙ্গে তুলনামূলকভাবে কিছু ছোটখাট প্রতিক্রিয়া হয়। যদিও এসব অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এবং যথাযথভাবে দমন করা হয়েছিল, এই বিষয়ে মিথ্যা এবং অতিরঞ্জিত খবর পূর্ববাংলায় প্রচার হতে থাকে। এই প্রচার পরিষ্কার সরকারী প্রচেষ্টায় হয়েছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ভয়াবহ। দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে পূর্ববাংলায় নারী নির্যাতন, নারীধর্ষণ, অসহায় মানুষকে জোর করে ধর্মান্তকরণ এবং প্রাণহানি ও সম্পত্তি ধ্বংসের এমন সব শোচনীয় ঘটনা সমস্ত দেশ জুড়ে ঘটতে আরম্ভ করে যা কোনো সভ্য সরকারের কখনো সহ্য করা উচিত নয়। আমাদের কাছে যা খবর পৌঁছেছে তার ভিত্তিতে একথা বলা যায় এগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। পূর্ববাংলাকে সংখ্যালঘুশূন্য করার এক ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনারই অঙ্গ এগুলি; এই কথা অস্বীকার করা মানে কঠিন সত্য ভুলে যাওয়া। এই সময় আমাদের নিজেদের প্রচারযন্ত্র কি দেশে, কি বিদেশে একেবারেই দুর্বল এবং অকর্মক অবস্থায় ছিল। যাতে ভারতে ভিতরে প্রতিক্রিয়া না হয় সেটাই আংশিকভাবে এর কারণ। কিন্তু পাকিস্তান সম্পূর্ণ উল্টো অবস্থান নিয়েছিল। এর ফল হল, ভারত আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত হল—যদিও বাস্তব তার ঠিক উল্টো। সেই কঠিন সময়ে যদিও কিছু উত্তেজিত মানুষ ছিলেন, বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু চাইছিলেন যে ভারত সরকার এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিক এবং পাকিস্তান পৈশাচিকতা বন্ধ করুক। সেই সময় কিন্তু আমরা তাদের হতাশ করলাম। যখন একদিন— এমনকি এক ঘণ্টা সময়ও গুরুত্বপূর্ণ, আমরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ নষ্ট করেছি অব্যবস্থিতচিত্ত অবস্থায়। পুরো দেশ যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, আমাদের কাছ থেকে কিছু কাজ আশা করছিল তখন আমরা শুধু বসে বসে সময় কাটিয়েছি, কি করতে হবে ঠিক করতে পারিনি। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের আরো কিছু জায়গায় মানুষ ধৈর্য হারাতে আরম্ভ করল এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করল। আমি এ কথা খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, পাকিস্তানে যে পৈশাচিকতা হচ্ছিল তার প্রতিবাদে ভারতে কিছু নির্দোষ মানুষকে হত্যা কোনো সমাধান হতে পারে না। এর ফলে যে চক্র তৈরি হয় তা আরো ভয়ঙ্কর; এতে মানুষের মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয় এবং এমন সব অপশক্তির উদ্ভব ঘটে যাকে পরে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমরা একটি সভ্য রাষ্ট্র, আমাদের সেরকম আচরণই করতে হবে, এবং রাষ্ট্রের সব নাগরিক যাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রাখেন তাঁদের সকলকে ধর্মনির্বিশেষে নিরাপত্তা দিতে হবে।

এরকম সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হয় এবং সরকার যদি যথেষ্ট তৎপর না হয় এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গত চাহিদা মাথায় রেখে এগোয় তবে নিঃসন্দেহে সব মানুষই সরকারের সপক্ষে এসে দাঁড়াবে। সরকার অবশ্য দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যাপারে সফল। এর মধ্যে, কম সংখ্যায় হলেও বেশ কিছু মুসলিম দেশ ছাড়তে আরম্ভ করেছিল তবে এদের মধ্যে অনেকেই পূর্ববাংলার, যারা জীবিকার সন্ধানে ভারতে ঢুকেছিল। এইবার পাকিস্তান অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারল, কারণ উদ্বাস্তু আগমনটা আর একমুখী থাকল না। গত জানুয়ারি মাস থেকে অন্তত দশ লক্ষ মানুষ পূর্ববাংলা ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় এসেছেন। অনেকে ত্রিপুরা ও অসমেও গেছেন। যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে হাজার হাজার মানুষ ভারতে ঢুকবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, এবং এঁদের মধ্যে সব শ্রেণীর ও সব অবস্থার মানুষই আছেন।

অতএব আজকে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, পাকিস্তানে কি সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাবোধ নিয়ে থাকতে পারবে? (লেখকের মন্তব্য : পাঠক লক্ষ্য করবেন, শ্যামাপ্রসাদ এখান নিরাপত্তার নয়, নিরাপত্তাবোধের কথা বলছেন—যেটা আসল প্রয়োজন, একথা এই বইতেও আগে বলা হয়েছে)। চুক্তি করে কোনো লাভ হল কিনা সেটার পরিচয় ভারতে বা বিদেশে চুক্তির প্রতি প্রতিক্রিয়া নয়— সেটার পরিচয় পাকিস্তানের হতভাগ্য সংখ্যালঘুদের অথবা যারা এর মধ্যেই ভারতে চলে এসেছেন তাঁদের মানসিক অবস্থা। পাকিস্তানে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কি ভাবলেন বা কিছু করতে চাইলেন কিনা সেটা এক্ষেত্রে অবান্তর। পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র সরকারী কর্মচারীদের মানসিকতা, সাধারণ মানুষের মনোভাব এবং আনসার সদৃশ সংগঠনের কীর্তি, এসব মিলে সেদেশে হিন্দুদের বেঁচে থাকাকেই দুর্বিষহ করে তুলেছে। এমনও হতে পারে যে কয়েকমাস ধরে কোনো বড়রকম অত্যাচারের ঘটনা ঘটল না। এর মধ্যে আমরা মহাউদার হয়ে পাকিস্তানের যা যা প্রয়োজন সব দিয়ে দিলাম, ফলে তাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটল। পাকিস্তান এই কায়দা অবলম্বন করেই চলেছে। হয়তো পরবর্তী আক্রমণ আসবে বর্ষাকালে, যখন যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়।

এই চুক্তির অংশীদার হতে আমি রাজী নই। তার প্রধান কারণগুলি আমি এইবার বলছি।

প্রথমত—দেশভাগ হবার পরে এরকম দুটি চুক্তি হয়েছে এবং পাকিস্তান

দুটিরই খেলাপ করেছে, যার কোনো প্রতিকারের রাস্তা আমাদের কাছে ছিল না। যে চুক্তিতে এরকম ব্যবস্থা নেই তা করে কোনো লাভ হবে না।

দ্বিতীয়ত— সমস্যার মূল নিহিত আছে পাকিস্তানের 'ইসলামী রাষ্ট্রে'র ধারণায় এবং তার উপর ভিত্তিকৃত এক প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক প্রশাসনের মধ্যে। চুক্তি এই বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছে এবং ফলে আমরা চুক্তির আগে যেখানে ছিলাম সেইখানেই থেকে গেছি।

তৃতীয়ত— দেখে মনে হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান দুয়েরই সমান দোষ। বাস্তবে তো পাকিস্তানই আক্রমণকারী! চুক্তিতে লেখা আছে, দুই দেশের রাষ্ট্রিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনো প্রচার বরদাস্ত করা হবে না, এবং কোনো যুদ্ধে প্ররোচনাও দেওয়া হবে না। এটা হাস্যকর— কারণ এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আমাদের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরের একটা অংশ দখল করে আছে এবং সেখানে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

চতুর্থত— ঘটনাপরম্পরায় প্রমাণ হয়ে গেছে যে পাকিস্তানের দেওয়া নিরাপত্তার আশ্বাসবাণীর ভিত্তিতে হিন্দুরা পূর্ববাংলায় থাকতে পারবে না। এটাকে একটা মূল ভিত্তি হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত। অপরপক্ষে এই চুক্তিতে বলা হচ্ছে যে সংখ্যালঘুরা তাদের সম্মান ও নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান সরকারের উপরেই নির্ভর করে থাকবে। এটা আঘাতের পর অপমানের মতো। অতীতে তাদের যা আশ্বাস আমরা দিয়েছি এটা তারও বিরোধী।

পঞ্চমত— যাদের ক্ষতি হয়েছে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেবার কোনো কথা চুক্তিতে নেই। যারা দোষী তাদের কোনোদিন কোনো সাজাও হবে না, কারণ কোনো পাকিস্তানী আদালতে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবার সাহস কারুর হবে না। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা তাই-ই বলে।

ষষ্ঠত— হিন্দুরা পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসতেই থাকবে। যারা এর মধ্যেই চলে এসেছে তারাও ফিরে যাবে না। কিন্তু মুসলিম যারা ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল তারা এইবার ফিরে আসবে, এবং আমাদের চুক্তি রূপায়ণ করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা দেখে আর কোনো মুসলিম ভারত ছেড়ে যাবে না। এর ফলে আমাদের অর্থনীতি প্রচণ্ডভাবে ঘা খাবে এবং দেশের ভিতরে সংঘাতের সম্ভাবনাও বাড়বে।

সপ্তমত— ভারতের মধ্যে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবার ছলে এই চুক্তির

মাধ্যমে ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের যে সমস্যা ছিল তাকে আবার মদত দেওয়া হল। এর ফলে সেইরকম রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হল যাদের চেষ্টায় পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল। এই নীতি যদি শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এর ফলে এমন সব সমস্যার উদ্ভব হবে যা আমাদের সংবিধানেরই বিরোধী।

বিকল্প কোনো উপায় বা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করার সময় বা সুযোগ, কোনোটাই এখন নেই। সরকারের অনুসৃত নীতির ফলাফল দেখেই সেসব সম্বন্ধে ভাবা যাবে। যাঁরা এই চুক্তি করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কোনো প্রশ্ন তুলছি না। আমি কেবল আশা করব যে এই চুক্তি শুধু একতরফাভাবে পালিত হবে না। যদি এই চুক্তি সফলকাম হয় তা হলে আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউই হবে না। আর যদি চুক্তি ব্যর্থ হয় তাহলে এটি হবে একটি বিয়োগান্ত পরীক্ষা, যার জন্য দেশকে অনেক দাম দিতে হবে। শুধু আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করব, যাঁরা এই চুক্তিতে বিশ্বাস করেন তাঁরা যেন নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন এবং পূর্ববাংলা ভ্রমণ করেন। একা যাবেন না—নিজেদের স্ত্রী, বোন, মেয়েদের নিয়ে যাবেন, এবং পূর্ববাংলার হতভাগ্য হিন্দু সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সাহসের সঙ্গে বাস করে দেখাবেন, তাঁদের সমব্যথী হবেন। সেটাই তাঁদের বিশ্বাসের সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ হবে। এই সরকার এই সমস্যাটির সমাধানকল্পে এমন একটা রাস্তা নিয়েছেন যার কোনো তুলনা বোধহয় ভূভারতে নেই এবং আমি এর সঙ্গে পুরোপুরি অন্য মত পোষণ করি। কিন্তু আমি এই সদনকে এই আশ্বাস দিতে চাই যে এই মুহূর্তে ভারতের মধ্যে শান্তি, সুস্থিতি ও নিরাপত্তা বজায় রাখবার ব্যাপারে আমি একমত। সরকারের উপর যথাসম্ভব চাপ সৃষ্টি করতে হবে সরকার যথাযথভাবে এবং সময় থাকতে তোষণনীতির কুফলগুলি এড়াবার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে এবং কোনোরকম অত্যাচার না হয় তা নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু দেশের মধ্যে কোনোরকম বিশৃঙ্খলা বা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির কোনো প্রচেষ্টাকেই উৎসাহ দেওয়া যাবে না। সরকার আর একবার চেষ্টা করতে চাইছে, এটিই চেষ্টা করার শেষ সুযোগ, করুক চেষ্টা। কিন্তু সরকারকে যারা সমালোচনা করবে তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য যেন কোনো চেষ্টা না হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য, চুক্তির একজন স্বাক্ষরকারী যারা বার বার চুক্তির খেলাপ করেছে, তারা যেন মুখে নয়, কাজে করে দেখায় যে তারা এই চুক্তি রূপায়ণ করতে পারে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি

পালন করতে পারে। এই সতর্কবাণীতে সরকারের বিচলিত হওয়া উচিত নয়, কারণ এর ফলে সরকার আরো সচেষ্ট এবং আরো সতর্ক হয়ে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে।

উদ্বাস্তু সমস্যার ব্যাপারে তাদের পুনর্বাসন—যা একটি বিরাট সমস্যা— তার কথাও ভাবতে হবে। ভাঙা বাংলায় পশ্চিমবঙ্গ একা এই ভার বহন করতে পারবে না। এটি এমন একটি সমস্যা যার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সবরকম প্রচেষ্টা নিতে হবে। সরকার এবং সরকারের সমালোচক এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই সহযোগিতা রাখতে হবে। তার কারণ, এই সমস্যা বহু লক্ষ মানুষের সুখশান্তি প্রদানের সমস্যা, এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সমস্যা।

সংযোজন - ২

শ্যামাপ্রসাদ, তাঁর মৃত্যুরহস্য এবং প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন ঃ যার উত্তর মেলেনি

আমার তখন আট বছর বয়স, দক্ষিণ কলকাতার একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলেপড়ি। একদিন হঠাৎ ঘোষণা হল কাল ছুটি হবে, কোনও এক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মারা গেছেন। আমরা কি জানি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপ্যাধ্যায় কে? ছুটি পাবার আনন্দে মশগুল হয়ে বাড়ি গেলাম, দেখলাম বাবা-মা একটু বিমর্ষ। একবার বললেনও, মানুষটাকে এমন করে মেরে দিল।

আপাতত শ্যামাপ্রসাদ পরিচ্ছেদের ওইখানেই ইতি। কিন্তু কী ভাবে জানি না, ওই মৃত্যু একটা বীজ বপন করে দিয়েছিল, যার থেকে জাত-মহীরূহ আমি আজও মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছি।

অনেক কাল পরে শ্যামাপ্রসাদের জীবনী লিখবার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য বিভিন্ন মানুষের কাছে ঘুরছি। মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চান্ন বছর গত, যাঁদের এই বিষয়ে স্মৃতি ছিল, তাঁরাও অনেকেই গত। থাকার মধ্যে আছেন প্রাক্তন সহকর্মী বলরাজ মাধোক, বয়স নব্বই ছুঁই-ছুঁই, আরও আছেন কেদারনাথ সাহানি। পরিবারের মধ্যেও তখনও আছেন পুনে-প্রবাসী জ্যেষ্ঠা কন্যা সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউ ইয়র্ক-প্রবাসী কনিষ্ঠা আরতি ভট্টাচার্য, ভাগনে অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। এঁরা আর কেউ ইহজগতে নেই— আমার পরম সৌভাগ্য যে এঁদের সাক্ষাৎকার নিতে পেরেছিলাম। যাঁরা এখনও আছেন (এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আরও বহুকাল থাকুন) তাঁদের মধ্যে ভাইপো প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, ভাগ্নি রীনা ভাদুড়ি, আর এক ভাগ্নি অমিতা রায়চৌধুরী, আর এক ভাইপো জনতোষ। নাতি শুভপ্রসাদও আছেন। অটলবিহারী বাজপেয়িও আছেন, কিন্তু বাকরুদ্ধ। এঁদের মধ্যে প্রথম দু'জনের কাছ থেকে যা সাহায্য পেয়েছি তার ঋণ শোধ হবে না।

এই সব জিজ্ঞাসাবাদ করে, এবং বইপত্র পড়ে যেটুকু জেনেছি তা সংক্ষেপে নিবেদন করি।

শ্যামাপ্রসাদের জীবনাবসান হয়েছিল, আমরা বলি কাশ্মীরে। কিন্তু রাজ্যটার নাম শুধু কাশ্মীর নয়, জম্মু ও কাশ্মীর, এবং এর একটা তৃতীয় অংশ আছে, যার

নাম লাদাখ। এর মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসী বেশির ভাগ কাশ্মীরিভাষী সুন্নি মুসলমান—একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় হিন্দু সংখ্যালঘুরা ছিল, যাদের বলা হত 'পণ্ডিত— বর্তমানে তারা বিতাড়িত, নিজের দেশে উদ্বাস্তু। জম্মু অঞ্চলের মানুষ বেশির ভাগ ডোগরিভাষী হিন্দু বা শিখ, লাদাখের মানুষ বেশির ভাগ বৌদ্ধ।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল। কাশ্মীরের মহারাজা তখনই কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে সম্মতি দেন। তার পরে ভারতীয় সেনাবাহিনী বহু কষ্ট করে কাশ্মীরে প্রবেশ করে এবং হানাদারদের পশ্চাৎধাবন করে। এই যুদ্ধে অন্যতম সেনানায়ক ছিলেন একজন বাঙালি, ব্রিগেডিয়ার এল পি সেন। যখন আর একটু এগোলেই হানদার বাহিনীকে কাশ্মীর-ছাড়া করা যাবে তখন এই বিচিত্রতম অবিমৃশ্যকারিতার বশবর্তী হয়ে পণ্ডিত নেহরু সেনাবাহিনীকে থামিয়ে দেন, এবং কাশ্মীর অংশত হানাদারদের দখলে থেকে যায়—যার নাম আজকে পিওকে, অর্থাৎ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর। পণ্ডিত নেহরুর এই পাণ্ডিত্যের দায় আজ পর্যন্ত ভারতবাসী বয়ে বেড়াচ্ছে।

এই যুদ্ধবিরতির পরে কাশ্মীরের মসনদে বসেন শ্রেখ আবদুল্লা। এবং বসেই তিনি নানা রকম বিচ্ছিন্নতাপন্থী আওয়াজ মাঝে মাঝে ছাড়তে থাকেন। তাঁরই চাপে কাশ্মীরে এই সময় এক পারমিট প্রথা চালু হয়, যাতে করে ভারতীয় নাগরিকদের এক পারমিট নিয়ে কাশ্মীরে ঢুকতে হত। শেখ আবদুল্লা জাতে কাশ্মীরিভাষী সুন্নি মুসলমান, জম্মুর ডোগরাদের তিনি অপছন্দ করতেন—ঘৃণা করতেন বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। নানা রকম ভাবে তিনি জম্মুর মানুষকে হেনস্তা করতে থাকেন ও দ্বিতীয় শ্রেনির নাগরিক হিসাবে গণ্য করেন। এর প্রতিবাদে পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরার নেতৃত্বে জম্মুর মানুষ ফুঁসে ওঠেন।

শ্যামাপ্রসাদ তখন দক্ষিণ কলকাতা থেকে নির্বাচিত সাংসদ, এবং লোকসভায় পদে পদে ব্যাক্যবাণে নেহরুকে বিপর্যস্ত করছেন। এর আগে তিনি নেহরুর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন, কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে হিন্দু হবার অপরাধে বিতাড়িত বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যপারে নেহরু যে ঔদাসীন্য ও গয়ংগচ্ছ মনোভাব দেখিয়েছিলেন তার প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা ছেড়ে দিয়েছেন, এবং ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামে নতুন দল সৃষ্টি করেছেন।

এই ভারতীয় জনসঙ্ঘই বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা

পার্টির পূর্বসুরি। শ্যামাপ্রসাদ ডোকরাদের সমর্থন করেন এবং তাদের শেখ আবদুল্লা বিরোধী লড়াইয়ে পুরোপুরি শামিল হন। অবশেষে তাঁদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বার জন্য ১০ মে ১৯৫৩ তারিখে তিনি দিল্লি থেকে এক প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পাঠান কোট অভিমুখে যাত্রা করেন। সেই সঙ্গে ঘোষণা করেন যে যেহেতু তিনি ভারতীয় নাগরিক তাই তাঁর কাশ্মীরে ঢুকবার অধিকার আছে, এবং তিনি পারমিট ছাড়াই কাশ্মীরে ঢুকবেন। সেই তাঁর শেষ যাত্রা।

শেষ যাত্রা না জেনেও এর আগে শ্যামাপ্রসাদ একবার কলকাতায় এলেন এবং মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। এই সময় বহু মানুষ তাঁকে যেতে বারণ করেছিলেন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী সচ্চিদানন্দ, সুচেতা কৃপালানি এবং সম্ভবত ডা. বিধানচন্দ্র রায়ও। কিন্তু জুলিয়াস সিজার যেমন কারও বারণ না শুনে সেনেটে গেলেন এবং ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিলেন তার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের এই যাত্রার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

দিল্লি থেকে রওনা হয়ে আম্বালা, কারনাল, নিলোখেরি, ফাগওয়ারা, জলন্ধর হয়ে শ্যামাপ্রসাদ পাঠানকোট পৌঁছলেন। প্রতিটি জায়গায় তাঁকে বিশাল জনতা সম্বর্ধনা জানিয়েছে। পাঠানকোটে পৌঁছবার পর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল যা থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আঁচ পরিষ্কার পাওয়া গিয়েছিল। ঘটনা এই রকম ঃ পাঠানকোট পৌঁছবার আগেই ট্রেনে এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং পরিচয় দিয়েছিলেন যে তিনি গুরুদাসপুর জেলার ডেপুটি কমিশনার। তিনি আরও জানালেন যে তিনি দিল্লি থেকে নির্দেশের অপেক্ষা করছেন, এই নির্দেশ পেলেই তাঁর কাজ হবে শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করা। শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে বললেন তাঁর যা কর্তব্য, তাই করতে, ওঁর নিজের যা কর্তব্য তা তিনি করবেন। কিন্তু পাঠানকোট পৌঁছবার পরে সেই ভদ্রলোক নিজেই খুব আশ্চর্য হয়ে তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে জানালেন যে তাঁর উপর নির্দেশ এসেছে শ্যামাপ্রসাদকে কোনও রকম বাধা না দেওয়ার এবং নির্বিঘ্নে মাধোপুর, অর্থাৎ পাঞ্জাব এবং জম্মু-কাশ্মীরের সীমানায় পৌঁছে দেওয়ার।

পরে বোঝা গিয়েছিল এই বিচিত্র আচরণের মানে কী। শ্যামাপ্রসাদকে যদি পাঠানকোট, অর্থাৎ পাঞ্জাবে গ্রেপ্তার করা হত তার হলে সুপ্রিম কোর্টে 'হেবিয়াস কর্পাস' আবেদন করে তাঁকে ছাড়িয়ে আনা যেত। কিন্তু সেই সময় জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অঙ্গীভূত হলেও সুপ্রিম কোর্টের আওতার বাইরে ছিল, এবং

সেই জন্যই ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাঁকে কাশ্মীরে ঢুকতে দেওয়ার। জম্মু-কাশ্মীরের আইন সে সময় ভারত থেকে অনেকটাই আলাদা, এবং সেখানে একবার গ্রেপ্তার হলে মুক্তি পাওয়া অনেক কঠিন।

তার পরেই শুরু বিয়োগান্ত নাটকের। মাধোপুর সীমান্তে রাভি নদীর উপর সেতুর মাঝখানে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। তারা শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করল, এবং একটি বন্ধ জিপে করে সোজা জম্মু শহর পার হয়ে শ্রীনগরের দিকে পাড়ি দিল। জম্মু শহরে হাজার হাজার লোক তাঁকে মালা নিয়ে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল, তারা জানতেও পারল না তাঁদের প্রিয় নেতাকে লুকিয়ে তাঁদের সামনে দিয়ে পাচার করা হচ্ছে। রাত্রিবাসের জন্য গাড়ি থামল বাটোট-এ তার পর তাঁকে নিয়ে প্রথমে শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেল, তার পর ডাল লেকের ধারে একটি ছোট্টো কুটিরে তাঁর জায়গা হল। সঙ্গে রইলেন তাঁর দুই সঙ্গী দেরাদুনের যুবক টেকচাঁদ ও আয়ুর্বেদিয় চিকিৎসক গুরুদত্ত বৈদ।

এই ছোট্টো কুটিরটিকে নেহরু বার বার এক 'পিকচারেস্ক বাংলো' বলে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে এটি সে রকম কিছুই ছিল না। একটি টিলার উপর অবস্থিত একটি কুটির মাত্র, সাব-জেলে রূপান্তরিত। এখানে একটি টেলিফোন পর্যন্ত ছিল না। এটা নিয়ে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল, এর আশেপাশে হাঁটাচলা করার জায়গা ছিল না। যেটুকু জায়গা ছিল তার মধ্যে গাছগাছালি এবং সবজির ক্ষেত, দু-তিন মিনিট হেঁটেই আবার ঘুরতে হত— এই ভাবে কি হাঁটা যায়? শ্যামাপ্রসাদের পায়ে অসম্ভব ব্যথা হত, এবং আমি দু'জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে তাঁর সম্ভবত 'ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস' ছিল। এইরোগে পা'কে সচল রাখা অত্যাবশ্যক, এবং না হলে এর ফলে হৃদযন্ত্রের সমস্যা হতে পারে। সম্ভবত হয়েও ছিল তাই। শ্যামাপ্রসাদ হাঁটবার জায়গার জন্য আবেদন করেছিলেন, শেখ আবদুল্লার হুকুমে তা নামঞ্জুর হয়।

শ্যামাপ্রসাদ যখন এই কুটিরে কারারুদ্ধ তখন নেহরু এবং তাঁর গৃহমন্ত্রী কাটজু বিনোদনের জন্য শ্রীনগরে এসেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ তখন সংসদে সম্ভবত সবচেয়ে উজ্জ্বল বিরোধী নেতা। এই দুই মন্ত্রীর এইটুকু ভদ্রতাবোধ হল না যে তাঁরা কারারুদ্ধ শ্যামাপ্রসাদকে একবার দেখে যাবেন, কুশল সংবাদ নিয়ে যাবেন। উল্লেখ্য, এর মধ্যে তাঁর পরিবারের কারওকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি, তাঁর চিঠিপত্র সেন্সর করা হত, যার ফলে চিঠি বাড়িতে পৌঁছতে দেরি

হত। সেই সঙ্গে তাঁকে এই বলে দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি চিঠি বাংলায় না লেখেন, কারণ শেখ আবদুল্লার পুলিশ বাংলা পড়তে বা বুঝতে পারত না। তাঁর পক্ষে যে ব্যারিস্টার ছিলেন সেই ইউ এম ত্রিবেদীকে পর্যন্ত একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করতে হয়েছিল— এমনি ছিল শেখ আবদুল্লার হুকুম। ত্রিবেদী তাঁর সঙ্গে ১৮ জুন এবং পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা ১৯ জুন দেখা করেছিলেন। দু'জনেই তাঁকে অত্যন্ত মনমরা এবং বিধ্বস্ত দেখেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁদের বলেছিলেন যদি তিনি একটু হাঁটবার সুযোগ পেতেন তা হলে অনেক ভালো থাকতেন। এই যন্ত্রণা কি তাঁকে জেনে বুঝে দেওয়া হচ্ছিল?

যে দিন ডোগরা তাঁকে দেখতে আসেন সে দিন রাত্রেই তাঁর জ্বর ও বুকে ব্যথা হয়। পরদিন সকালে বেলা সাড়ে এগারোটায় ডা. আলি মহম্মদ ও ডা. অমরনাথ রায়না তাঁকে দেখতে আসেন। ডা. আলি মহম্মদ নির্দেশ দেন তাঁকে স্টেপ্টোমাইসিন দেবার জন্য, শ্যামাপ্রসাদ প্রতিবাদ করে বলেন স্ট্রেপ্টোমাইসিন তাঁর সহ্য হয় না, কিন্তু ডা. আলি মহম্মদ তা শোনেননি। গুরুদত্ত বৈদ জেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যেন তাঁর অসুস্থতার খবর তাঁর পরিবারকে জানানো হয়। অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়। এমনকী তাঁর মৃত্যুর আগে একটি মেডিকেল বুলেটিন পর্যন্ত জারি হয়নি।

একুশে জুন তাঁকে দেখতে বড়ো ডাক্তার কেউ আসেননি। জেলের ডাক্তার— নেহাতই জুনিয়র— তাঁকে আরও স্ট্রেপ্টোমাইসিন ফুঁড়ে দেন। ২২ জুন ভোররাত্রে তাঁর পরিচারক এসে গুরুদত্ত বৈদ্যকে ডেকে তোলে। বৈদ এসে দেখেন শ্যামাপ্রসাদের শরীর ঠাণ্ডা, অসম্ভব ঘাম হচ্ছে। সকলকে খবর দেওয়া হল। ডা. আলি মহম্মদ এলেন সকাল সাড়ে সাতটায়, এবং পরীক্ষা করে বললেন তাঁকে এখনই কোনও নার্সিং হোমে ভর্তি করা দরকার। জেল সুপার বললেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লাগবে। শেষ পর্যন্ত বেলা এগারোটা নাগাদ তাঁকে হাঁটিয়ে—স্ট্রেচারে নয়— কটেজের বাইরে নিয়ে আসা হল এবং একটি সাধারণ ট্যাক্সি করে—অ্যাম্বুলেন্স নয়—নিয়ে যাওয়া হল কোথায়? কোনও নার্সিং হোম নয়, স্ট্রেট হাসপাতালের স্ত্রীরোগ ওয়ার্ডে, একটি ঘরে— তাঁর দায়িত্বে ডা. জগন্নাথ জুৎসি বলে এক জুনিয়ার ডাক্তার। সে দিন বিকেলে ব্যারিস্টার ত্রিবেদী কোর্টে সওয়াল শেষ করে এসে দেখেন শ্যামাপ্রসাদ খাটে বসে কিছু কাগজপত্র দেখছেন।

ভারতের সংসদের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি এখনও পর্যন্ত বিনা বিচারে

বন্দি হয়ে আছেন, এবং যাঁর স্পষ্টতই হার্টঅ্যাটাক হয়েছে, তাকে এই ভাবে নিয়ে যাবার কথা ভাবা যায়? অন্ততপক্ষে শ্রীনগরে যেটুকু চিকিৎসার সুবিধা ছিল তার সর্বোত্তম সুবিধাটা তাঁর পাওয়া উচিত ছিল নাকি? কিন্তু যা হল তা শেখ আবদুল্লার ব্যক্তিগত হুকুমেই হল, কারণ তাঁর নির্দেশ ছিল শ্যামাপ্রসাদের ব্যাপারে তাঁর হুকুম ছাড়া যেন সামান্যমাত্র কাজটিও করা না হয়। শুধু তাই নয়। এই অবস্থায় রোগীকে বাথরুমে যেতে দেওয়ারও কথা নয়, বেডপ্যান ব্যবহার করার কথা। সেখানে তাঁকে খাটে উঠে বসতে দেওয়া হল। পরে মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডা. গিরধারী লাল এসে তাঁকে বলেন ওই ভাবে না বসতে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক বসা হয়ে গেছে।

এই হাসপাতালে ভর্তির পরের ব্যাপারটা আসল রহস্য। ত্রিবেদী সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে ছিলেন। যাবার আগে তিনি শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে করমর্দন করার সময় বুঝবার চেষ্টা করেন তাঁর জ্বর আছে কি না— দেখলেন নেই। বলে গেলেন পরের দিন সকাল আটটায় ওঁকে দেখতে আসবেন। সেই ওঁর শেষ দেখা। রাত ৩.৪৫-এ পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট এসে ত্রিবেদীকে বলেন তখনই শ্যামাপ্রসাদের কাছে যেতে, কারণ ওঁর অবস্থা নাকি ভালো নয়। ইতিমধ্যেই টেকচাঁদ এবং গুরুদত্ত বৈদকেও খবর দেওয়া হয়েছিল, তাঁরাও এসে হাসপাতালে পৌঁছলেন। তখন তাঁদের জানানো হল রাত ৩.৪০ মিনিটে শ্যামাপ্রসাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সরকারি ভাবে এইটুকুই শুধু জানা গেছে, এবং এর থেকে অন্তত এটা পরিষ্কার যে তাঁর চিকিৎসায় চরম অবহেলা হয়েছিল, এবং সেই অবহেলা আবদুল্লার ব্যক্তিগত নির্দেশ ছাড়া হতে পারত না। এর আগে ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে ওঁর একবার হার্টঅ্যাটাক হয়েছিল, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওঁর শরীরের জন্য অনেক বেশি যত্ন নেওয়া কাশ্মীর সরকারের উচিত ছিল। এইবার দু'টি চাঞ্চল্যকর তথ্য, পড়ে পাঠক বিবেচনা করবেন তিনি যে ভাবে মারা গেলেন তার মধ্যে কারও কুকীর্তি ছিল কি না?

২৪ এপ্রিল ২০১০ তারিখে আমি শ্যামাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম, পুনের কোরেগাওঁ পার্কে, তাঁর ফ্ল্যাটে। তখন সবিতার ৮৪ বছর বয়েস, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ, স্মৃতি পরিষ্কার, একটি ফ্ল্যাটে একা পরিচারিকা নিয়ে থাকেন, পাশের ফ্ল্যাটে তাঁর মেয়ে থাকেন। তিনি

বললেন, শ্যামাপ্রসাদ গত হবার পরে পুত্র অনুতোষ কাশ্মীরে যাবার জন্য পারমিটের আবেদন করেছিলেন। সে আবেদন পত্রপাঠ খারিজ হয়ে যায়, কারণ আবেদনে পিতার নাম লেখা হয়েছিল। তার পরে সবিতা এবং তার স্বামী নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবদনে করে পারমিট পান, কাশ্মীর যাত্রা করেন, এবং শ্রীনগরে পৌঁছে একটি হাউসবোটে ওঠেন। সে সময় শ্যামাপ্রসাদের লন্ডনের বন্ধু যতীন্দ্রনাথ মজুমদারও কাশ্মীর বেড়াতে এসেছিলেন, তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁরা যখন শ্যামাপ্রসাদের কথা বলছিলেন তখন একটি কাশ্মীরি বেয়ারা তঁদের চা দিচ্ছিল। বেয়ারা বাংলা বুঝবে না, এই মনে করে তাঁরা খোলাখুলি সব কথা আলোচনা করছিলেন। যতীন্দ্রনাথ চলে যাবার পরে বেয়ার হঠাৎ তাঁদের জিজ্ঞাসা করে তাঁরা শ্যামাপ্রসাদের কথা বলছিলেন কি না। তাঁরা তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়ে যান এবং বলেন, শ্যামাপ্রসাদ বাঙালি কি না, সেইজন্য তাঁর কথা বলছিলেন। বেয়ারাটি এইবার কাছে এসে নিচু গলায় বলে, শ্যামাপ্রসাদ কোথায় ছিলেন তা সে জানে, এবং চাইলে সে তাঁদের সেখানে নিয়ে যেতে পারে।

সে দিন রাত্রে সবিতা ঘুমোতে পারেননি। পরের দিন সেই বেয়ারার সঙ্গে সেই কুটিরে গেলেন এবং টিলার উপর উঠতে উঠতে ভাবছিলেন, তাঁর বাপি খারাপ পা নিয়ে এই টিলায় চড়তে কত কষ্ট পেয়েছিলেন। সবিতা তাঁর ডাক্তারের নাম-ঠিকানা জানতে চাইলেন। বেয়ারা বলল সে সে সব কিছু দিতে পারবে না, কিন্তু সবিতা যদি চান তা হলে সে ওঁর নার্সের কাছে ওঁকে নিয়ে যেতে পারে। নার্সের নাম ছিল রাজদুলারী টিক্কু।

তার পরে তাঁরা নার্সের বাড়ি গেলেন। রাজদুলারী এবং তাঁর মা দু'জনে সেই বাড়িতে থাকতেন। সবিতা পরিচয় দিতেই নার্স ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন, এবং বললেন আপনারা এখুনি এখান থেকে চলে যান, আমি কিচ্ছু বলতে পারব না। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সবিতা রাজদুলারীর প্রায় পায়ে ধরলেন। তখন রাজদুলারী যা বললেন তা এক কথায় যেমনই রোমহর্ষক তেমনই করুণ।

রাজদুলারী বললেন, ডা. আলি মোহাম্মদ তাঁকে একটা এম্পুল দিয়ে বলেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ জাগলে তাঁকে এই ইনজেকশনটা দিয়ে দেবে। শ্যামাপ্রসাদ জাগলেন এবং রাজদুলারী তাই করলেন। শ্যামাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে লাগলেন, 'জ্বল যাতা হায়, হামকো জ্বল রহা হায়।' ভীত রাজদুলারী ডা. আলি

মোহাম্মদকে ফোন করলেন। ডাক্তার বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক কিন্তু হল না, সব শেষ হয়ে গেল।

এই পর্যন্ত বলে রাজদুলারী বললেন, আমি মহাপাপ করেছি, তাই তোমাকে না বলে থাকতে পারলাম না। কিন্তু এর পরে তোমারা আমার খোঁজ কর না, কালকেই আমি আর আমার মা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কারণ তোমাদের এই কথা বলেছি এটা রাষ্ট্র হলে আমি খুন হয়ে যাব।

শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ কলকাতায় আসবে শুনে ২৩ শে সকাল থেকে জনসমাগম হতে শুরু করে। জনতার সিংহভাগ ছিল পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুরা, যাঁদের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। ২৩শে রাত দশটা নাগাদ মরদেহ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছয়, এবং দমদম বিমানবন্দর থেকে ভবানীপুরে নিজের বাড়িতে পৌঁছতে অত রাত্রেও প্রায় সাত ঘণ্টা লেগে যায়—এমন ভিড় ছিল রাস্তায়। বহু মানুষ সে দিন রাত্রে বাড়ির সামনে ট্রামলাইনের উপর শুয়ে কাটিয়েছেন। চব্বিশ তারিখে তাঁর শবযাত্রার যে ছবি আছে তাতে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর দেহ যখন কালীঘাট পোস্ট অফিসের সামনে তখন জনতার পিছনের সারি ভবানীপুর থানারও পিছনে—অর্থাৎ এক কিলোমিটারের চেয়ে বেশি লম্বা শবযাত্রা, রাস্তার প্রস্থ জুড়ে শুধু মানুষ।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরে ডা. আলী মোহাম্মদের ও ডা. রামনাথ পারহারের যুগ্ম সইতে একটি ঘোষণা জারি হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রাত এগারোটার সময় তাঁর রক্তচাপ কমে যাওয়া ও ছটফট করার ফলে তাঁকে অক্সিজেন ও আমিনোফিলিন ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। রাত একটার সময় তাঁর রক্তচাপ নেমে ৯০/৭০ হয়ে গিয়েছিল, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ। তাঁকে ১ সিসি পেথিডিন দেওয়া হয়। নাড়ীর গতি ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমেই ক্ষীণ হতে তাকে এবং তাঁর শিরার মধ্যে কোরামিন ইনজেকশন দেওয়া হয়, অক্সিজেন চলতে থাকে। তার পরে রাত ৩.৪০-এ নাড়ী ও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

এর পরে শেখ আবদুল্লার সইতে একটি ছোটো বিবৃতি, ও কাশ্মীর মন্ত্রিসভার কারামন্ত্রী পণ্ডিত এম এল সরাফের সইতে একটি বিস্তারিত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে সরাফ বলেন যে শ্যামাপ্রসাদের চিকিৎসা বিধিমতেই হয়েছিল

এবং তাঁর চিঠি থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে তিনি ওই কুটিরটিতে 'বেশ ভালো ছিলেন।'

তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ হবার পরে দেশের অগ্রগণ্য ডাক্তারদের মধ্যে অনেকে তাঁর চিকিৎসা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ডা. এন বি খারে এমডি বলেছেন, যখনই ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন যে তাঁর হৃদযন্ত্রের সমস্যা হয়েছে তার পরে তাঁকে নড়ানোই উচিত হয়নি, যেখানে ছিলেন সেখানেই চিকিৎসা করা উচিত ছিল। তা ছাড়া যখন দেখা গেল তাঁর রক্তচাপ নেমে গেছে তখন তাঁকে আমিনোফিলিন না দিয়ে ইন্ট্রাভেনাস ডেক্সট্রান ড্রিপ চালু করা উচিত ছিল। কলকাতার দুই অগ্রগণ্য ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এমডি এবং অমলকুমার রায়চৌধুরী এমডিও বলেন ভুল চিকিৎসা হয়েছে, তদন্ত করা দরকার। পাটনা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. টি এন ব্যানার্জী এবং ডা. আম্বালাল শর্মার নেতৃত্বে আজমীরের ডাক্তাররা একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করেও একই কথা বলেন— যে চিকিৎসা ভুল হয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই সব কচকচিতে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু এটা কি পরিষ্কার নয় যে তাঁর চিকিৎসাবিভ্রাট ও অযত্ন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে? এর সঙ্গে যোগ হয়েছে উপরে বর্ণিত পাঠানকোটে সেই বিচিত্র ঘটনাবলী যাতে জেলার ডেপুটি কমিশনার পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। এবং শ্যামাপ্রসাদ তো হেঁজিপেঁজি লোক ছিলেন না, একজন সাংসদ এবং বিরোধী পক্ষের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে কি তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে অন্তত একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত ছিল না?

অবশ্যই উচিত ছিল। এবং তাঁর মা যোগমায়া দেবী সেই দাবিই জানিয়েছিলেন নেহরুর কাছে। আশ্চর্য ঔদ্ধত্যের সঙ্গে নেহরু সেই দাবি খারিজ করে দিয়ে বলেন, আমাকে কিছু অত্যন্ত ওয়াকিবহাল মানুষ যা জানিয়েছেন তার ভিত্তিতে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে তাঁর যথাযথ চিকিৎসা হয়েছিল। অতএব— কোনও তদন্ত দরকার নেই।

এখানে উল্লেখ্য, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান-রহস্য উদঘাটনের জন্য পাঁচ-পাঁচটি তদন্ত হয়েছিল— তার মধ্যে শাহ নওয়াজ, খোসলা ও মুখার্জী কমিশন ভারতের, ফিগেস রিপোর্ট ব্রিটিশের এবং একটি জাপানি তদন্ত। গান্ধীজি, যিনি বহু মানুষের চোখের সামনে মারা গেছেন তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারেও কাপুর

কমিশন বসেছিল। অথচ এই মানুষটি অত্যাচারীদের ষড়যন্ত্রে, প্রিয়জনের চোখের আড়ালে থেকে চলে গেলেন, তবু কোনও একটা তদন্ত হল না। কিন্তু বলিদান কখনও বিফলে যায় না— তাঁর এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং আরও বহু মানুষের আত্মদানের ফলেই আজ তাঁর উত্তরসুরি প্রধানমন্ত্রীর আসনে আসীন।

শেষ তথ্য : শ্যামাপ্রসাদের শোকে যখন পশ্চিমবঙ্গ মুহ্যমান, তখন ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বাড়ার প্রতিবাদে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তেরোটা ট্রাম জ্বালিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য সফল হয়, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর কথা মানুষ আস্তে আস্তে ভুলে যায়।

লেখক "The Life and Times of Dr. Syama Prasad Mukherjee' (প্রভাত প্রকাশন)-এর গ্রন্থকার, বর্তমানে ত্রিপুরার রাজ্যপাল।

রচনায় ব্যক্ত মতামত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত

সংযোজন - ৩

'১৯৫০ সাল। স্থান—পশ্চিম দিনাজপুর, উত্তরবঙ্গ। ঘটনা কি? স্থানীয় হিন্দুরা দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন করতে পারছেন না। মুসলমান সম্প্রদায় বাধা দিয়েছে। তারা বলেছে তাদের মসজিদের সামনে দিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা করলে তারা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হিন্দুদের ওই শোভাযাত্রার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ফলে ছয় মাস হল প্রতিমা ওই মণ্ডপেই পড়ে আছে।

কলকাতার বীর শ্যামাপ্রসাদের কানে কথাটা পৌঁছান মাত্রই তিনি পশ্চিম দিনাজপুর যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। অনেকেই নিষেধ করলেন—তিনি কারো কথাই শুনলেন না। পরের দিনেই যাত্রা শুরু করলেন। সরকারি তরফ থেকে জেলা প্রশাসনকে ব্যাপারটা জানান হল। দিনাজপুর ড: শ্যামাপ্রসাদ পৌঁছানো মাত্র জেলা শাসক সহ পুলিসের পদস্থ অফিসাররা অনুরোধ করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না।

ড: শ্যামাপ্রসাদ বললেন— ৫০০ ঢাক-ঢোলের ব্যবস্থা কর, আর সব হিন্দুকে এক হতে বলো। পরশু প্রতিমা বিসর্জন হবে। শুধু একজন জেনে এসো ওদের নমাজ পড়ার সময়টা কখন? আর বললেন সব হিন্দুদের হাতে যেন একটা করে লাঠি থাকে। পশ্চিম দিনাজপুরে হিন্দুদের মধ্যে একটা বিরাট উন্মাদনা এসে গেল। বন্দেমাতারম ও ভারতমাতার জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। পুলিস প্রশাসন খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল।

নির্দিষ্ট দিনে দুর্গা প্রতিমা সহ নিরঞ্জন শোভাযাত্রা শুরু হল। সঙ্গে ১০০টি ঢাক ঢোল (৫০০ না পাওয়া যাওয়ায়) হিন্দু বালক যুবা বৃদ্ধ সবারই হাতে লাঠি, কপালে চন্দনের তিলক। সর্বাগ্রে চলেছে হিন্দুবীর ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গলায় চাদর, পরনে ধুতি, কপারে তিলক। নির্বিঘ্নে প্রতিমা নিরঞ্জন সমাপ্ত হল।

পরের দিন স্থানীয় মুসলমান নেতৃত্বস্থানীয় কয়েকজন ড: শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করে বলল—আমরা সব প্রস্তুত ছিলাম, দাঙ্গা লাগবে বলে— দাঙ্গা তো দূরের কথা, এই বিরাট ব্যাপার এত সুষ্ঠুভাবে শেষ হবে ভাবতেও পারিনি। উত্তর শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন—

"আপনারা একটু ভদ্র হোন, আর ভারতকে সামান্য একটু ভালবাসুন। তাহলেই হবে। হিন্দুরা খুবই ভদ্র।"

শ্যামাপ্রসাদের বংশ লতিকা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (আদিতে জিরেট নিবাসী)
১৭৮৭-১৮৪৯
ব্রহ্মময়ী

দুর্গাপ্রসাদ ১৮৩২-১৯০৫
হরিপ্রসাদ ১৮৩৪-১৮৯৯
গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৩৬-১৮৮৯
রাধিকা প্রসাদ ১৮৩৯-১৮৯৪

জগত্তারিণী - ১৮৫০-১৯১৪

আশুতোষ ১৮৬৪-১৯২৪
হেমন্তকুমার
হেমলতা ১৮৭৪-১৯০৩

যোগমায়া - ১৮৭২-১৯৫৬

কমল ১৮৯৫-১৯২৩
রমাপ্রসাদ ১৮৯৬-১৯৮৪
শ্যামাপ্রসাদ ১৯০১-১৯৫৩
উমাপ্রসাদ ১৯০২-১৯৯৭
অমলা ১৯০৫-১৯৫০
বামাপ্রসাদ ১৯০৬-১৯৮৩
রমলা ১৯০৮

শুভেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়- তারা - দেবী - সুধা দেবী
কুন্তলা - অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়
ব্রজেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুতোষ - মীরা
সবিতা - নিশীথরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
আরতি - পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য
দেবতোষ - আভা